রাণীশংকৈলের (দিনাজপুর) কৃষক আন্দোলন : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

মোহাম্মদ আবুল হোসেন

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম. ফিল ডিগ্রীর শর্তপূরণের প্রয়োজনে উপস্থাপিত থিসিস

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

কে, এ, এম, সা'দউদ্দিন
অধ্যাপক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382828

Dhaka University Library
382828

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

জানুয়ারী, ১৯৯৮

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i
অধ্যায়		
১	প্রারম্ভিক আলোচনা, আন্দোলন ও সংগঠন : তত্ত্ব, প্রত্যয় ও পদ্ধতি	১
২	বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের পটভূমি	১৬
৩	রাণীশংকৈলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২৮
৪	রাণীশংকৈলের আন্দোলন	৩৯
৫	বিশ্লেষণ ও উপসংহার	৮৮
	গ্রন্থপঞ্জী	১১০
	পরিশিষ্ট	

382828

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণাকর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কে, এ, এম, সা'দউদ্দিন । বস্তুত তাঁর নিরন্তর তাগাদা, দিক নির্দেশনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শই এ গবেষণাকে সম্ভব করেছে । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এ গবেষণা কর্মের বিষয় ও শিরোনামের নির্বাচনও তাঁর চিন্তার আলোকেই পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে । এবং গবেষণাপত্রের ভাষাগত উৎকর্ষ অর্জনে তাঁর নিরন্তর সহযোগিতা পেয়েছি ।

গবেষণা কাজ চলাকালে বিভাগীয় প্রধান ডঃ মাহমুদা ইসলাম অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে প্রয়োজনীয় একাডেমিক সহযোগিতা করেছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর সরদার আমিনুল ইসলাম, ডঃ মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, ডঃ এইচ,কে, শামসুল আরেফিন এবং ডঃ নজরুল ইসলামও বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান, শামসুজ্জোহা মানিক ও ডঃ লেনিন আজাদের প্রতি । বই পুস্তকের রেফারেন্স, গবেষণা বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার খাতিরে ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমানের সঙ্গে প্রায় নিয়মিতই আলোচনা করতে হয়েছে । এ অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ সহায়তা পেয়েছি।

একইভাবে দীর্ঘদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে ডঃ লেনিন আজাদও সহযোগিতা করেছেন । ষাটের দশক এবং পরবর্তীতে বাম রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব সামসুজ্জোহা মানিক, দিনের পর দিন আমাকে বিস্তর সময় দিয়েছেন ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আহমেদ কামাল এবং বিআইডিএস-এর গবেষণা ফেলো ডঃ বিনায়ক সেনও বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। গবেষণাপত্রের শৈলী বিন্যাসে দরকারি সহযোগিতা পেয়েছি প্রীতিভাজন সাংবাদিক আলতাফ পারভেজের কাছ থেকে। এছাড়া ঢাকায় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে যথাক্রমে দীন মোহাম্মদ, হায়দার আলী মাস্টার ও সোহরাব হোসেন-এর কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি আমি । স্নেহভাজন নাসিরউদ্দিনও এক পর্যায়ে রাণীশংকৈল সম্পর্কিত কিছু তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন।

সমগ্র গবেষণাপত্রটি অসীম নিষ্ঠায় কম্পিউটারে বিন্যাস্ত করেছেন বিআইডিএস-এর শফিকুল ইসলাম মোল্লা । এ ছাড়া অক্ষর বিন্যাসে সেখানকার বুলবুল আহমেদও কিছু ভূমিকা রেখেছেন । সবশেষে স্মরণ করছি ব্যক্তিগত বন্ধু আলী এনামুল এমরানের কথা । গবেষণা কাজের সময় ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়ে বিশেষ নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম ।

382828

মোহাম্মদ আবুল হোসেন
জানুয়ারী, ১৯৯৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক আলোচনা : আন্দোলন ও সংগঠন, তত্ত্ব, প্রত্যয় ও পদ্ধতি

স্বাধীনতার পর আশির দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু কৃষক আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনগুলোর কোন কোনটি স্থানীয় পরিসর অতিক্রম করে জাতীয় পরিসরে গণ-মাধ্যমগুলোতেও খবর হয়ে উঠেছিলো (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮২)। দিনাজপুর জেলার রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন তেমনি একটি আন্দোলন; একটি ঘটনা ।

রাণীশংকৈল থানার বলিদ্বারা, কলিগাঁও, উত্তরগাঁও এবং বাক্সা সুন্দরপুর– এই চারটি গ্রামের আধিয়ার[১] কৃষকদের জমি সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে রাণীশংকৈলের আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারন করে। চার গ্রামের জমি কেন্দ্রিক সমস্যা অর্থাৎ *আধিয়ার-কৃষকদের* সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা ইতিহাস।

১.১ ঘটনা ও বিষয়বস্তুর অবতারণা

১৯৪০-এর দশকে গদা নাথ ঝাঁ নামে একজন জোতদারের দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় কয়েক হাজার বিঘা জমি ছিলো । এই *জোতদার* ছিলেন রাণীশংকৈলের *জমিদার* টংকনাথ চৌধুরীর জামাতা। তবে তার জন্মভূমি ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনা জেলায়। পাটনা থেকে তিনি দিনাজপুরে আসেন এবং দিনাজপুর শহরে বাড়ি করেন। গদা নাথ ঝাঁ রাণীশংকৈল থানার উল্লেখিত মৌজাগুলোর ৭১২ বিঘা জমিরও মালিক ছিলেন।

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে গদা নাথ ঝাঁ ভারতের পাটনা জেলার সৈয়দ নুরুল হুদার সংগে বাড়ি ও সম্পদ বদল করেন। গদা নাথ ঝাঁ সৈয়দ নুরুল হুদার চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক ছিলেন। তাই সম্পদ বদলের পরও গদা নাথ ঝাঁ-র আরো কিছু অতিরিক্ত জমি থেকে যায়। এই অতিরিক্ত জমির মধ্যে রাণীশংকৈলের চার মৌজার জমিগুলোও পড়ে। যা গদা নাথ ঝাঁ সৈয়দ নুরুল হুদার কাছে বিক্রি করেন বলে নথিপত্রে দেখা যায় (তদন্ত প্রতিবেদন, অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী, ১৪ আগস্ট, ১৯৯৩)।

জমিগুলো প্রায় অনাবাদী অবস্থায় ছিলো। সৈয়দ নুরুল হুদা ১৯৫০-এর দশক থেকে জমিগুলো আবাদের উদ্যোগ নেন। তিনি রাজশাহী থেকে বেশ কিছু সাঁওতাল পরিবারকে এনে তাঁর জমিতে বাড়ি-ঘর করার সুযোগ দেন । এই সাঁওতাল পরিবারগুলো ঝাড়-জংগল পরিষ্কার করে বর্গা বা *আধি* স্বত্বে কিছু কিছু জমি আবাদ করে। ১৯৫০ দশকের শেষের দিকে এবং ষাট দশকের

Dhaka University Institutional Repository

গোড়াতে আরো কিছু ভূমিহীন পরিবারকে সৈয়দ নুরুল হুদা তার জমিতে বাড়ি করার সুবিধা দিয়ে *আধিস্বত্বে* জমি আবাদ করতে দেন। এই পরিবারগুলোর মধ্যে কিছু এসেছিলো পশ্চিম বংগের মালদহ জেলা থেকে, আর কিছু বগুড়া জেলার নদী-ভাংগন এলাকা সারিয়াকান্দি থেকে । কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত জমি আবাদে চলে আসে। আধিয়ার-কৃষকরা নিয়মিত ফসলের ভাগ দেন জমির মালিক নুরুল হুদাকে (দৈনিক উত্তরা, ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১)।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষের দিকে সৈয়দ নুরুল হুদা দিনাজপুর থেকে চলে যান। তিনি অবাংগালী ছিলেন তাই তাঁকে চলে যেতে হয়।

১৯৭২ সালে রাণীশংকৈলের স্থানীয় নেতৃত্ব অর্থাৎ সে সময়কার ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা আধিয়ার-কৃষকদের কাছ থেকে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে ফসলের ভাগ আদায় করে । আধিয়ার কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও ফসলের একটা অংশ তারা দিতে থাকেন (দৈনিক উত্তরা, ২ মে, ১৯৮১)।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে । এ পরিবর্তনের ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা ফসলের ভাগ নেয়া থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকে। এদিকে ১৯৭৫ সালেই চার গ্রামের জমিগুলোকে অবাংগালীর পরিত্যক্ত জমি হিসেবে স্থানীয় ভূমি অফিসের পক্ষ থেকে নথিভুক্ত করা হয় । এবং আধিয়ার কৃষকদেরকে একসনা বন্দোবস্ত[২] দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে একসনা বন্দোবস্ত দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে জমিগুলো *আধিয়ার* কৃষকদের দখল এবং আবাদেই থেকে যায়।

১৯৭৬-৭৭ সালে মধ্যস্বত্বভোগী কতিপয় ব্যক্তি ভূমি অফিসের জনৈক নোমান তহসিলদারের[৩] উদ্যোগে জমিগুলোর জাল দলিল তৈরী করে বলে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে এবং এর সত্যাসত্য বিচারের পর এই অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। জমিগুলোর জাল কাগজ-পত্র[৪] অধ্যাবদি ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিস ও আদালতের নথি পত্রে পাওয়া যাবে (প্রাগুক্ত) ।

১৯৭৮ সালে পুলিশের সহায়তায় *আধিয়ার কৃষকদের* জমি দখল করে নেয় জাল দলিলকারী মধ্যস্বত্বভোগী[৫] লোকজন। আধিয়ারদের কাছেও জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টা পরিষ্কার ছিলো। জমির মালিক নেই, কিন্তু জমিটা তারা দীর্ঘদিন ধরে আবাদ করছেন। এবং ইতিপূর্বে একসনা বন্দোবস্ত নিয়েছেন। এ জমির নতুন কেউ মালিক হলে *আধিয়ার-কৃষকরাই* হবে -এ রকম একটা যুক্তি ছিলো আধিয়ারদের। এছাড়া তারা জমিটার দখলি মালিকও বটে (বিচিত্রা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮২)।

জমি দখলের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে সহযোগিতা করে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। আন্দোলনের আগে পুলিশী নিপীড়নের বহু ঘটনাও ঘটে । ১৯৭৮ সালে আধিয়ার-কৃষকদের নিকট থেকে বেশির

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ জমি কেড়ে নেয় মধ্যস্বত্বভোগীরা । আধিয়ার কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে। তারা একটা উপায়ের সন্ধান করে। পুলিশী জুলুম আর মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উপায় খোঁজ করতে শুরু করে।

১৯৭৯ সালের দিকে কৃষক মুক্তি সমিতি[৬] নামে একটি সংগঠন রাণীশংকৈল এলাকায় গরু চুরি, কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম, হাট খাজনা বন্ধ ইত্যাদি ইস্যুতে কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে। সংগঠনে তখন লোকজন তেমন ছিলোনা। তবে কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কথা বলার ফলে সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটে।

চার গ্রামের আধিয়ার-কৃষকরা তাদের উপর দীর্ঘ দিন ধরে মধ্যস্বত্ব এবং পুলিশী-নিপীড়নের কথা জানান এই সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্বকে। ধীরে ধীরে আধিয়ার-কৃষকদের জমির সমস্যাটি কৃষক মুক্তি সমিতির আন্দোলনের ইস্যু হয়। এবং ১৯৮০ সালে আধিয়ার-কৃষকদের সমস্যাটি রাণীশংকৈলের আন্দোলনের প্রধান ইস্যুতে পরিনত হয়। বস্তুত এই ইস্যুতে সংগঠনের আরো ব্যাপ্তি ঘটে।

১৯৮১ সালের গোড়াতেই কৃষক মুক্তি সমিতির নেতৃত্বে আধিয়ার কৃষকরা জমি দখলের আন্দোলনের দিকে এগুতে থাকে। অন্যদিকে জমির সমস্যাকে চিহ্নিত করে ইতিমধ্যেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থাৎ জাল দলিল বাতিল করে জমিগুলোকে সরকারী খাস জমি ঘোষণা এবং আধিয়ার কৃষকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য কৃষক মুক্তি সমিতির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে দরখাস্তও করা হয় ।

এদিকে আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে মিছিল, মিটিং ব্যাপকভাবে শুরু হয় । রাণীশংকৈলে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। রাণীশংকৈল এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য উভয় পক্ষকে একটা সমঝোতার মধ্যে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের আতাতের কারণে সমঝোতা সম্ভব হয়নি (নতুন কথা, ৫ মে, ১৯৮১)।

১৯৮১ সালে এপ্রিল মাসে *আধিয়ার-কৃষকরা* কলিগাঁও গ্রাম থেকে জমি উদ্ধার আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলিগাঁও গ্রামের মাঠে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট জমিতে লাল ঝান্ডা উড়িয়ে চাষ দেয়া হয় এবং আউস ধান বোনা হয়। জমি চাষ দেয়ার সময় মধ্যস্বত্ব পক্ষের বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসে কিন্তু তারা মাঠে নামার সাহস পায়নি । কৃষকরা এতোই সংগঠিত ছিলো যে, পেশাদার লাঠিয়াল এবং ডাকাতরাও তা দেখে ভয় পেয়ে যায় (নতুন কথা, ৫ মে, ১৯৮১)।

মধ্যস্বত্বভোগীদের লাঠিয়াল বাহিনী ভয় পেয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই রাণীশংকৈল থানা[৭] থেকে একদল পুলিশ আসে। পুলিশ দলটি থানার দারোগার নেতৃত্বেই আসে। আধিয়ার কৃষকরা

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের উপর ঝাপিয়ে পড়ার উপক্রম হলে তাদেরকে থামিয়ে দেয় কৃষক নেতারা । দারোগা[৮] (ওসি) চার গ্রামের কয়েকজন কৃষক এবং কৃষক মুক্তি সমিতির নেতাদের সংগে জমির সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত একটা আহবান জানান। কৃষক নেতারা এ আহবানে সারা দেন। কৃষক নেতাদের নির্দেশেই শত শত কৃষক নিজেদের বাড়িতে চলে যায় । আলোচনার স্থান ঠিক হয় 'বলিদ্বারা বাজার'। বলিদ্বারা বাজারের দিকে এগুতে থাকে কৃষক নেতারা এবং পুলিশের দলটি। কিন্তু বলিদ্বারা না পৌছাতেই পুলিশ সবাইকে গ্রেফতার করে । পুলিশের এ চতুরতা কৃষক নেতা-কর্মীরা বুঝে উঠতে পারে নি। এ দিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় তাৎক্ষণিকভাবে সংগঠনের কৃষক কর্মীরা ঘটনা স্থলে হাজিরও হতে পারেনি ।

ঘটনার রাতে রাণীশংকৈল থানায় গ্রেফতারকৃত ২০ জন কৃষক নেতা-কর্মীকে প্রচন্ড মারধোর করা হয়। এবং সূর্য উঠার আগেই বেশ কিছু বৈদ্যুতিক তারসহ একটা ট্রাকে তুলে কৃষক নেতাদেরকে ঠাকুরগাঁও জেল-হাজতে পাঠানো হয়। তাদের বিরুদ্ধে বৈদ্যুতিক তার চুরির অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয় ।

রাতেই রাণীশংকৈলের গ্রাম-গঞ্জে খবর ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন সকালে কৃষকরা খন্ড খন্ড মিছিলে থানার (পুলিশ স্টেশন) দিকে এগিয়ে আসে। কৃষক নেতা-কর্মীদের ঠাকুরগাঁও জেল-হাজতে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে যায় কৃষকরা । কৃষকরা মিছিল করতে করতে ২০ মাইল দূরের ঠাকুরগাঁও শহরে চলে যায় পায়ে হেটে । কৃষক ছাড়াও অন্যান্য পেশার লোকজন রাণীশংকৈলে জড়ো হয় এবং পায়ে হেটেই ঠাকুরগাঁও অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এভাবে এক হাজারের বেশি কৃষক-জনতা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঠাকুরগাঁও এস.ডি.ও অফিস ঘেরাও করে। শ্লোগানে মুখরিত হয় ঠাকুরগাঁও শহর। 'পুলিশী জুলুম বন্ধ কর, জাল দলিল বাতিল কর, কৃষক নেতাদের মুক্তি চাই'– এ সবই ছিলো শ্লোগানের ভাষা (নতুন কথা, ২৯ এপ্রিল, ১৯৮১)।

প্রায় এক হাজার মানুষ জেল গেট এবং আদালত ভবনের পাশে বসে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দেখে পর দিনই চাপের মুখে সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনার পর রাণীশংকৈলের আন্দোলন আরো গতিময় হয়ে উঠে। এলাকার ছাত্র, যুবক ও মহিলারাও আন্দোলনে যোগ দেয়। কিছু দিনের মধ্যেই চার গ্রামের সমস্ত জমি দখল করে নেয় আধিয়ার-কৃষকরা । জমি দখলের সময় বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষের কিছু কিছু আহত হবার ঘটনাও ঘটে ।

এদিকে পুলিশ কৃষক আন্দোলনকে দমনের জন্য অন্য কৌশল অর্থাৎ ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করে। পুলিশ আধিয়ার-কৃষক এবং কৃষক আন্দোলনের সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে একটার

Dhaka University Institutional Repository

পর একটা মিথ্যা মামলা দায়ের করা শুরু করে । ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে বৈদ্যুতিক তার চুরির অভিযোগ এনে যেভাবে কৃষক নেতা-কর্মীদের জেল-হাজতে পাঠানো হয়েছিলো, একইভাবে কৃষক নেতা-কর্মীদের বারবার জেল হাজতে পাঠানো হয়। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ– এই ধরনের নানান মিথ্যা মামলায় তাদেরকে জড়ানো হয়। কৃষক ও কৃষক নেতারা আদালত থেকে জামিনে নিয়ে কিছুদিন পর পরই চলে আসেন। এ সব ঘটনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের গতি আরো বেড়ে যায় (নতুন কথা, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৮১)।

একটা হিসেব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালে জুলাই থেকে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে কৃষক এবং কৃষক-নেতাদের বিরুদ্ধে ২৬টা মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলাগুলো হয় ফৌজদারী আদালতে। এ সবই হয় পুলিশ এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্যোগে । জমি কিংবা আধিয়ারদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোন মামলা হয়নি। এই ২৬টা মামলায় আসামী করা হয় মোট ৯০৯ জনকে। আদালতে একটা ব্যাপক খরচ হয় মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মামলা আদালতে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় (হোসেন, ১৯৮৬: ২০১)।

বস্তুত রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন চার গ্রামের আধিয়ার-কৃষকদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও তা চার গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকেনি । সমগ্র রাণীশংকৈল থানায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রভাবে রাণীশংকৈলের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও পুরনো ধারার পরিবর্তে নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। নাটক, যাত্রা, সংগীতে জীবন ঘনিষ্ট বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। রাণীশংকৈলের সর্বস্তরের জনতার মধ্যে এই আন্দোলনের একটা ব্যাপক ছাপ পড়ে। আন্দোলনের ফলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রাণীশংকৈলের চেয়ারম্যান এবং মেম্বার পদগুলোতে কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীরা বিজয়ী হন। এবং ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে কৃষক মুক্তি সমিতির একজন নেতাও নির্বাচনে বিজয়ী হন । কিন্তু এতো কিছুর পরও আধিয়ার কৃষকরা শোষণমুক্ত হয় নি; আর আন্দোলনও থেমে যায় নি (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮২; হোসেন, ১৯৯৬: ১৯০-৯৩)।

একটি ছোট পরিসরে শুরু হয়ে চার গ্রামের *আধিয়ার* কৃষকদের সমস্যার মধ্যদিয়ে রাণীশংকৈলের আন্দোলনটি বেগবান হয়। এবং এক পর্যায়ে এ আন্দোলন ক্ষুদ্র পরিধি ছাড়িয়ে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। নেতৃত্ব, সংগঠন এবং সামাজিক শক্তির বিন্যাস ঘটিয়ে আন্দোলনটি জাতীয় পর্যায়ের গণ-মাধ্যমগুলোতেও স্থান করে নেয়; জাতীয় সংসদেও এ আন্দোলনের প্রসংগটি কোন কোন সাংসদ দ্বারা উত্থাপিত হয় (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮২; নতুন কথা, ৮ আগস্ট, ১৯৮৬)।

Dhaka University Institutional Repository

রাণীশংকৈলের স্থানীয় পর্যায়ে ছোট পরিসরের যে আন্দোলনটি এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে জাতীয় পর্যায়ে খবর হয়ে উঠতে পেরেছিলো— তা একটি ঘটনা । ঘটনাটির তাৎপর্য কি? আন্দোলন কেন ঘটলো? আন্দোলনের প্রকৃতিটা কি ছিলো? আন্দোলনের নেতৃত্বে কারা ছিলো? কারা আন্দোলনের পক্ষ কিংবা প্রতিপক্ষ? আন্দোলনের শক্তি বিন্যাস কিভাবে ঘটেছিলো? স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর ধরনটাই বা কী ছিলো? স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা কি ছিলো? সর্বোপরি আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিলো? কেবল মাত্র সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলনের মাধ্যমেই এই প্রশ্নগুলোর যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

১.২ প্রত্যয় সমূহের আলোচনা

রাণীশংকৈলের *আধিয়ার* কৃষকদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলো এবং জাতীয় পর্যায়েও খবর হয়ে উঠেছিলো। তা বস্তুত ছিলো একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে হলে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত যথাযথ ধারণা এবং স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক।

১.২.১ আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন

আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন এ দু'টো বিষয়কে বর্তমান গবেষণা কর্মটির মূখ্য সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করা যায় । এ প্রত্যয় দু'টো সম্পর্কে অনেক সমাজবিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে আমরা প্রত্যয় দু'টোকে বোঝার চেষ্টা করবো।

ইংরেজী শব্দ 'Movement' -এর বাংলা প্রতি শব্দ হ'ল 'আন্দোলন'। অক্সফোর্ড অভিধানে 'Movement' তথা আন্দোলন-এর অর্থ দেয়া হয়েছে— The action or process of moving. বস্তুত আন্দোলন বলতে এখানে খুব সাধারণভাবে একটি ক্রিয়া বা গতিশীল প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত অভিধানে 'আন্দোলন' শব্দটির অর্থ বোধগম্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদাহরণ এবং বিবরণ দেয়া হয়েছে। এবং এগুলোকে সংগঠিত করে আন্দোলনের একটি সংজ্ঞাও দেয়া হয়েছে। সংজ্ঞাটি দেয়া হয়েছে এভাবে —

'A course or series of action and endeavours on the part of a body, persons, moving or tending more or less continuously towards some special end' (Oxford Dictionary, 1993: 729)। অক্সফোর্ড অভিধানের উদাহরণ, বিবরণ ও ব্যাখ্যা থেকে 'আন্দোলন' শব্দটির একটা বোধগম্য সংজ্ঞা দাঁড়িয়ে যায়। আর তা হ'ল: সংঘবদ্ধ কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তিসমষ্টি যখন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বিরতিহীনভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তখনই সমগ্র কর্মকান্ডটি একটি আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে (Ibid, 726-29)।

আন্দোলন বা সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী Paul Wilkinson ইংরেজী 'Movement' শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস টেনে দেখিয়েছেন যে, ফরাসী শব্দ 'Movoir' থেকে শব্দটি এসেছে। 'Movoir' একটি ক্রিয়াবাচক শব্দ। যার অর্থ হলো নড়া বা নড়ানো। 'Move'— উত্তেজিত করা বা ক্ষেপিয়ে তোলা (Stir), কিংবা তাড়না করা বা চালিত করা (impel)। পরবর্তীকালে ল্যাটিন শব্দ 'Movimentum'- এর সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তা 'Movement' শব্দে পরিণত হয়েছে (Wilkinson, 1971:11) ।

সমাজবিজ্ঞানী Rudolf Heberle তাঁর গবেষণায় ইংরেজী 'Movement' শব্দটির আদলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষাতে বেশ কিছু শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন (যেমন, 'Soziale Bewegung', 'Sociata Morelse' etc.)। এবং দেখিয়েছেন যে, ঐ শব্দগুলোর সংগে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধভাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশের বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের একটা সম্পর্ক রয়েছে (Heberle, 1951: 276)। তিনি আন্দোলনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> *".....The connotation is that there is a commotion, a stirring among the people, an unrest, a desire to approach a visualized goal. A 'movement' therefore is a collective ready for action by which some kind of change is to be achieved, some innovation to be made, or a previous condition to be restored (Ibid: 276)."*

Heberle তাঁর সংজ্ঞার মাধ্যমে আন্দোলনের একটি সাধারণ রূপ তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, জনসাধারণের প্রতিবাদ, উৎকণ্ঠা প্রকাশ কিংবা বিক্ষোভ প্রদর্শন কোন কারণ ছাড়া হয়না। এবং কারণ ছাড়া মানুষ সংগঠিতও হয় না। Heberle 'আন্দোলন' প্রত্যয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে দেখা যায়, একটি ঘটনা তখনই আন্দোলন হয়ে উঠে যখন জনসাধারণের মাঝে একটি প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটে । দ্বিতীয়তঃ এই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বা উৎকণ্ঠা প্রকাশের জন্য তারা সংগঠিত হয়; এবং সর্বোপরি, এই সংগঠিত বিক্ষোভ, প্রতিবাদ বা উৎকণ্ঠার পেছনে থাকে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য অর্জন। এ লক্ষ্য অর্জন আবার উৎকণ্ঠার কারণকে নিরসন করতে চায় অর্থাৎ একটি পরিবর্তনকে দাবী করে।

অক্সফোর্ড অভিধান থেকে 'Movement' শব্দটির যে অর্থটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং Heberle বর্ণিত পাশ্চাত্যের ভাষাগুলোতে ব্যবহৃত Soziale Bewegung, Sociata Morelse

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রকৃত প্রতিশব্দ যে ' Social Movement'– তা বোঝা যায়। সমাজবিজ্ঞানী Paul Wilkinson -এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন—

> *'In terms of general usage, both in England and in other European countries a social movement as series of actions and endeavours of a body of persons for a special object, has been generally predominant since the early nineteenth century (Wilkinson, 1971: 11-12)'*

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইতিপূর্বে অক্সফোর্ড অভিধান থেকে যে অর্থটি নেয়া হয়েছে Wilkinson ঠিক একই রকম ব্যাখ্যা করেছেন 'Social Movement' সম্পর্কে। এবং Heberle -এর বক্তব্য থেকে দেখা যায়, ইংরেজী Movement যে অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা পাশ্চাত্যের ভাষাতে কিছুটা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও শব্দগুলোর সংগে উৎকণ্ঠা এবং প্রতিবাদের একটা সম্পর্ক আছে। এবং এগুলোর প্রতিশব্দ 'Social Movement'-ই হতে পারে ।

আন্দোলন সম্পর্কে এ নির্ধারিত ধারণার আলোচনা থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয় যে, আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলন এ পদ দু'টির মাঝে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

International Encyclopedia of the Social Sciences -এ বর্ণিত সংজ্ঞাটিতে আন্দোলন তথা সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র, আন্দোলনের -মানুষদের বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে-

> "The concept of a 'social movement' is thus suggestive of people who, on the one hand, are in process of rejecting existing social values and arrangements, while, on the other, they are both striving to make converts to their way of seeing things and dealing with the resistance that their activities inevitably call forth. But while the movement is often carried by associations, it is not wholly an associational phenomenon. It is in the *system of generalized beliefs*, and in partisan commitment to such *beliefs*, that we find the characterizing features of a social movement. The unity and coherence of a movement, in its various stages and forms, depend on the similarity of the adherents' beliefs about the legitimacy of a new way of behaving, of their rejection of what has been, and of their demand for adoption of the new (Gusfield, Joseph R., 1972: 446) ।

আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই—এ সম্পর্কে ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় । কিন্তু যাকে 'কৃষক আন্দোলন' বলা হয়— তা আন্দোলন বা সামাজিক আন্দোলন কি-না, সে সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন থাকতে পারে । International

Dhaka University Institutional Repository

Encyclopedia of the Social Science-এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ আলোচনা থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে । কৃষকদের লড়াই কিংবা বিদ্রোহকে এখানে 'Protest Movement' বলা হয়েছে। যার বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রতিবাদ আন্দোলন'। 'Protest Movement' স্থানীয় হতে পারে; আবার আঞ্চলিক হতে পারে, এমনকি জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এই 'প্রতিবাদ আন্দোলন' বিস্তৃত হতে পারে । আলোচনার এক পর্যায়ে বলা হয়েছে-

> 'Transformation of a protest movement into a genuine social movement is possible' (Gusfield, Joseph R., 1972: 446) ।

আন্দোলন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে, 'Protest Movement' আদতে আন্দোলন বা সামাজিক আন্দোলন। এবং কৃষকের লড়াই বা বিদ্রোহ 'Protest Movement' হওয়ায় তা আন্দোলন বা সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, রাণীশংকৈলের আন্দোলন একটি কৃষক আন্দোলন এবং এটি একটি সামাজিক আন্দোলনও বটে। কারণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও সংগঠন এ বিষয়গুলো অপরিহার্য । আর এ বিষয়গুলোর উপস্থিতি রাণীশংকৈলের আন্দোলনে ব্যাপকভাবেই দেখা যায় ।

১.২.২ রাষ্ট্র

রাণীশংকৈলের আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য রাষ্ট্র প্রত্যয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'রাষ্ট্র' একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় । বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র প্রত্যয়টি একটি জটিল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ প্রত্যয়টিকে নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। 'রাষ্ট্র' সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানীর মতামত থেকে আমরা প্রত্যয়টি সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবো ।

মার্ক্সীয় ধারায় রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিকশিত বক্তব্য রেখেছেন লেনিন। তাঁর মতে– সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণীসমূহ অন্যান্য শ্রেণীর উপর শোষণ চালায়; আর শোষিত হয়েও যাতে এ সকল শ্রেণী বিনা প্রতিবাদে শোষণকে মেনে নেয়– তার নিশ্চয়তা বিধান করে রাষ্ট্র। এবং সে ভাবেই রাষ্ট্রের আইন-কানুনকে সাজানো হয়, সেই আইন অনুযায়ী শাস্তি দেবার জন্য গঠন করা হয় আদালত, জেল ও বিভিন্ন ধরনের বাহিনী (Poulantzas, 1976:75)। লেনিন দেখিয়েছেন, রাষ্ট্র শুধু শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার নয়, রাষ্ট্র শ্রেণী নিপীড়নেরও হাতিয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবারের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি উচ্চতম রাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনের আওতাভূক্ত লোকালয়, ব্যক্তি ও বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার থাকে একচেটিয়া । যে কোন ব্যক্তির উপর প্রয়োজনে বল প্রয়োগের ন্যায্য অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রই দাবী করতে পারে। অর্থাৎ ওয়েবারের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি আবশ্যিক রাজনৈতিক সংগঠন, যার কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ের জনসাধারণ এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার চূড়ান্ত অধিকার রয়েছে (Weber, 1968:54)।

ওয়েবার আরো বলেছেন, রাষ্ট্রের হাতে এতো ক্ষমতা থাকলেও এটাই রাষ্ট্রের চরিত্রের প্রধান দিক নয়। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, ন্যায়নীতি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু যতোই ন্যায় নীতি ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হোক না কেন, সমাজে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি উক্ত কর্মসূচির সব কিছুর সাথে একমত হবেন। ফলে এ কর্মসূচি অনেকের দ্বারাই সমালোচিত হবে, অনেকেই সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে । ঠিক এমন পর্যায়েই রাষ্ট্রের বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে (Weber, Ibid: 55)।

উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র সম্পর্কে হামজা আলাভী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, উপনিবেশিক শাসন-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে উপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা গড়ে উঠা রাষ্ট্র এখনও টিকে আছে। তাই এ সমস্ত দেশে অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান আমলাতন্ত্র হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রণহীন (Alavi, 1973:151)। আলাভীর এ বক্তব্যকে এ. জি. ফ্রাঙ্ক আরো এগিয়ে নিয়েছেন । তার মতে, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ শ্রেণী সমূহের নিয়ন্ত্রণ থেকে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন, ঠিক তেমনই আন্তর্জাতিক পুঁজির দ্বারা সে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয় (Frank, 1981: 235-37)।

বস্তুত রাষ্ট্র একটি মূর্ত প্রপঞ্চ। নানাবিধ উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে উঠে। তবে এর মূল উপাদান দুটি: আইন বিভাগ বা পার্লামেন্ট এবং শাসন বিভাগ বা আমলাতন্ত্র । বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র একটি উপাদান মনে হলেও মূলগতভাবে তা আমলাতন্ত্রের সংগে সম্পর্কিত । রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংস্থা হিসেবে আইন বিভাগ বা পার্লামেন্ট আইন ও নীতি প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু আইন প্রয়োগের ক্ষমতা তার নেই । আইন প্রয়োগের ক্ষমতা শাসন বিভাগ বা আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে। আমলাতন্ত্রের রয়েছে ব্যাপক দমনমূলক প্রবনতা । আর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের দমনমূলক এ প্রবণতাটি উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত ।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, রাণীশংকৈলের আন্দোলনে ভূমি অফিস স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং আদালত আন্দোলনকে দমনের চেষ্টা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তারা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে জনস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা নেয় তা রাণীশংকৈলের আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনায় স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

১.৩ কৃষক আন্দোলনের তত্ত্ব

রাণীশংকৈলের আন্দোলনকে বোঝার জন্য কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত তত্ত্বগুলোকে জানা প্রয়োজন । কৃষক আন্দোলন একটি সামাজিক ঘটনা । সামাজিক ঘটনাকে অধ্যয়নের অদম্য আগ্রহ থাকে সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে । কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে অনেক সমাজ বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠার কারণকে খুঁজেছেন; আবার অনেকেই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। কৃষক আন্দোলনের ধরন নিয়েও অনেকেই গবেষণা করেছেন । এ পর্যায়ে কৃষক আন্দোলন বিশারদদের তত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে ।

Scott কৃষক সমাজের বিদ্রোহের বিষয়টিকে নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত করেছেন । তিনি এই শতাব্দীর তিরিশ দশকের উপনিবেশিক বার্মা ও ভিয়েতনামের দু'টি কৃষক বিদ্রোহ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন কৃষির বানিজ্যিকিকরণ ও রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে সৃষ্ট ভূমি মালিকানা ও কর ব্যবস্থায় কৃষক সমাজ উপেক্ষিত হয়। এই 'উপেক্ষিত হবার বোধই' কৃষক সমাজকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয়। বস্তুত তিনি সামাজিক ন্যায় বিচার, নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও অধিকারের বিষয়গুলো সম্পর্কে কৃষক সমাজের উপলব্ধির মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের কারণ খুঁজেছেন (Scott, 1976: vii, 3-4, 33)।

Ranajit Guha উপনিবেশিক ভারতের কৃষক বিদ্রোহের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, কৃষক বিদ্রোহের পেছনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে কৃষকদের মধ্যেকার একটি বিশেষ 'সচেতনতা বোধ'। উপনিবেশিক শহরগুলো গ্রাম সমাজের উপর ব্যাপক শোষণ ও লুণ্ঠনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামের মানুষের রক্ত নিংড়ানো অর্থ দিয়ে শহরগুলো গড়ে উঠেছে— এ ধরনের একটি 'বোধ' কৃষকদের মধ্যে বদ্ধমূল হতে থাকে। কৃষকদের মধ্যকার এ বোধই তাদেরকে ব্যাপক বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয় । Ranajit Guha কৃষকদের এ বোধকে *কৃষক বিদ্রোহের সচেতনতা* (*Peasant Rebel's Awareness*) বলেছেন (Guha, 1983: 11, 336-37) ।

Kartodirdjo ইন্দোনেশিয়ার কৃষকদের খাজনা বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠার পেছনে ভূমি কর এবং ভাড়া পরিশোধে কৃষকের অক্ষমতার বিষয়টিকে দেখতে পেয়েছেন। তিনি এই অক্ষমতা থেকে জন্ম নেওয়া ক্ষোভ থেকেই খাজনা বিরোধী আন্দোলনগুলো গড়ে উঠার কথা বলেছেন (Kartodirdjo, 1965: 43-47) ।

Dhaka University Institutional Repository

Shanin কৃষকদেরকে একটি সামাজিক সত্ত্বা হিসেবে (Social entity) দেখিয়েছেন। কৃষক ও কৃষক সমাজ সম্পর্কিত ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে তিনি কৃষক আন্দোলনের ধরন সম্পর্কে একটি আলোচনা করেছেন। তিন ধরনের কৃষক আন্দোলনের কথা Shanin-এর গবেষণা থেকে পাওয়া যায় । এই তিনটি ধরন হচ্ছে-

এক. স্বাধীন বা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে কৃষকদের আন্দোলন: উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধ থেকে ক্রমান্বয়ে কৃষক সমাজ একটি সামাজিক শ্রেণীর রূপ নেয়। সংগঠন গড়ে তোলা এবং নেতৃত্ব ঠিক করার মতো কাজগুলো তাদের নিজস্ব উদ্যোগে হয়। এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি আদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। উনবিংশ শতাব্দিতে মার্কস এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন । তবে বর্তমানে কৃষকদের এই রাজনৈতিক ধরনটি সচরাচর দেখা যায় না ।

দুই. রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে কৃষক আন্দোলন: এই ধরনের আন্দোলন কৃষক সমাজ বহির্ভূত এলিট শ্রেণী (External Power-elite) দ্বারা সংগঠিত হয়। কৃষক সমাজকে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের আন্দোলনে আবেগ প্রবন করে তোলেন। প্রাক-রাজনৈতিক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলোতে (Millenial movement) এই ধরনটি দেখা যায়। ফ্রেঞ্চ বোনাপার্টিজম বা মাও-এর পিপলস্ আর্মির ক্ষেত্রেও কৃষক সমাজকে গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতৃত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।

তিন. স্বত:স্ফূর্ত অথচ সুনির্দিষ্ট আকারহীন আন্দোলন (Spontaneous, amorphous Political action): কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে এই ধরনটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ধরনের মধ্যে দু'টো ধারা দেখা যায়:

(ক) স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক সমাজে দীর্ঘ দিনের হতাশা এবং পুঞ্জীভূত ক্ষোভের হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ ঘটে । বিদ্রোহের অনুভূতি নিয়ে কৃষক সমাজ ব্যাপক সংগ্রামে (Riots) জড়িয়ে যায় । এই ধরনের পরিস্থিতিকে কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিকভাবে কঠোর হস্তে দমন করে। সমাজে বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যার সংগে রাজনৈতিকভাবে সংযোগ ঘটিয়ে এই ধরনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে — তা জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারক ভূমিকা রাখতে পারে ।

(খ) আন্দোলনে কৃষক সমাজের অক্রিয়তা (Peasant passivity) । কৃষক সমাজের আন্দোলনে আগ্রহ-হীনতার বিষয়টা কৃষক সমাজের গঠন, সচেতনতা এবং অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝার একটা বিষয় । কৃষকদের আন্দোলনে অনাগ্রহ বা

Dhaka University Institutional Repository

অক্রিয়তাও এক ধরনের প্রতিরোধ । R.E.F Smith এ সম্পর্কে লেখেছেন: Passive resistance is actually a specifically peasant contribution to politics elaborated and sophisticated by Tolstoy and Gandhi (Shanin, 1971: 360-61) ।

কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠার কারণ, প্রকৃতি এবং আন্দোলনের ধরন সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে পাওয়া যায়, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আলোচ্য গবেষণাটির ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীদের উপরোক্ত বিশ্লেষণগুলো কতটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে, তা এই গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি

রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের মতো একটি ঘটনাকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য বেশ কয়েকটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয় । এই উৎসগুলোকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । এক. আন্দোলনটি সাম্প্রতিক কালের হওয়ায় - এর সংগে জড়িত লোকজনের সংগে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করাতে আন্দোলনের-মানুষগুলো সম্পর্কে এবং এলাকাটির সংগে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে— যা থেকে একটি কেস স্টাডি রচনা অনেকখানি সহজ হয়েছে । দুই. আন্দোলন শুরু হবার অল্প কিছুদিন পরই রাণীশংকৈলের আন্দোলনটি গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। গণ-মাধ্যমগুলোর মধ্যে সংবাদ পত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম । জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং স্থানীয় সংবাদ-পত্রগুলোতে এ আন্দোলনের বহু খবর এবং প্রতিবেদন ছাপানো হয়। সংবাদ-পত্রগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলো সংগ্রহ করা হয় এবং এগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে কেস স্টাডিটিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আন্দোলনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকের নাম চলে এসেছে । এ ক্ষেত্রে যাঁরা রাণীশংকৈল এলাকার তাদের আসল নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

যে কোন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য নির্বাচিত এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা জেনে নেয়া আবশ্যক। এ জন্য বেশ কিছু দলিল-দস্তাবেজেরও (Document) প্রয়োজন হয়। আলোচ্য গবেষণার জন্য-

(i) Bangladesh Census of Non-farm Economic Activities, 1986;

(ii) The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock, 1983-84;

(iii) Bangladesh Population Census, 1981 এবং 1991, মূলত এই তিনটি দলিল থেকে পরিসংখ্যানমূলক তথ্য নেয়া হয়েছে ।

সংবাদ-পত্র, বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ থেকে সংগৃহিত তথ্যকে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে । গবেষণা কর্মটিকে পরিপুষ্ট করার জন্য এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তিন, যে কোন সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্য সমীক্ষা- সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নেয়ার প্রয়োজন হয় । প্রয়োজন হয় গবেষকদের ইতোপূর্বে নির্মিত তত্ত্বগুলো সম্পর্কে একটা

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা নেওয়ার । তাই গবেষণা কর্মটির সংগে সম্পর্কিত বই-পুস্তক, থিসিস, জার্ণাল ইত্যাদি উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়েছে। এগুলো আলোচ্য গবেষণাটির জন্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

১.৫ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণা কর্মটির প্রধান উদ্দেশ্য রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় এক দশক পর বাণীশংকৈলের *আধিয়ার-কৃষকদের* আন্দোলন একটি ছোট পরিধিতে শুরু হয়ে কিভাবে বিকশিত হলো, আন্দোলনের প্রকৃতি ও নেতৃত্ব, আন্দোলনের পক্ষ-প্রতিপক্ষ, স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামো; আন্দোলনে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা এবং সর্বোপরি আন্দোলনের গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদর্শনই এ গবেষণার লক্ষ্য। উল্লেখিত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের পরবর্তী আলোচনা।

পাদটীকা

১. বর্গাদার, ভাগচাষী এবং ভাগদার— এ শব্দগুলো বাংলাদেশ এবং ভারতের বাংলা ভাষা-ভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে বহুলভাবে পরিচিত । এ শব্দগুলোর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Share-cropper'.

বর্গাদার, ভাগচাষী এবং ভাগদার— এ শব্দ তিনটির প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবে *আধিয়ার* শব্দটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে খুবই পরিচিত (Cooper, 1982: 234-35)। বর্গাচাষ বা ভাগচাষ সম্পর্কে বাংলায় ধারণাটা এভাবে প্রচলিত আছে যে, কৃষক বা চাষী শ্রম দেবে এবং জোতদার দেবে জমি। যে কোন একটি পক্ষ চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবে; এবং ফসল কাটার সময়ে ফসলের ভাগা-ভাগি হবে। এই ভাগা-ভাগিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষককে দিতে হয় মোট উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকাংশ। অর্থাৎ ভাগাভাগিটা হয় আধা-আধি। তাই এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে *আধি* হিসেবে এবং যে সমস্ত কৃষকরা এই ব্যবস্থাধীনে চাষাবাদ করেন তারা *আধিয়ার* নামে পরিচিত (কুপার, ১৯৯১: ১৪-১; কামাল, ১৯৯২: ৭)।

২. নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারী খাস জমি সরকারের পক্ষ থেকে কোন কৃষক বা অন্য কাউকে এক বছরের জন্য ভোগদখলে দেয়ার ব্যবস্থা । এই ভোগ-দখলের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট তহসিল বা ভূমি অফিস থেকে জমির ভোগ-দখলকারী ব্যক্তিকে একটা প্রাপ্তিপত্র (Receipt) প্রদান করা হয়। এই প্রাপ্তিপত্র সংক্ষেপে ডিসিআর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট) বলা হয় ।

৩. রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার । তহসিলদার নোমানের বাড়ি দিনাজপুর শহরে। ১৯৭০-র দশকের প্রথম দিকে তিনি রাণীশংকৈল তহসিল অফিসে তহসিলদার হিসেবে যোগদান করেন। চার মৌজার জমিগুলোর জাল-দলিল বানানোর ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিলো মূখ্য ।

৪. চার মৌজার জমির জাল কাগজ-পত্রের কপি ঠাকুরগাঁও মহকুমা, দিনাজপুর জেলা ও রাজশাহী বিভাগের ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিস ও কর্মকর্তাদের কাছে দাখিল করেন আধিয়ার কৃষক এবং কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীরা। ঐ কাগজগুলোকে জাল-কাগজ হিসেবে চিহ্নিত করেন দেন রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব)।

৫. মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত - এই তিন সামাজিক মর্যাদার লোকজনের সমাবেশ ছিলো। তবে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল এবং পরবর্তীতেও মধ্যস্বত্বের মূল নেতৃত্বে ছিলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। এই নেতাকর্মীরা

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন রকমের দূর্নীতির সংগেও জড়িত ছিলো । এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সংগে এরা স্বার্থগত সম্পর্কেও সম্পর্কিত ।

৬. 'কৃষক মুক্তি সমিতি', বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কৃষক ফ্রন্ট । ওয়ার্কার্স পার্টি একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল ।

৭. বাংলার পুলিশ প্রশাসনের মৌলিক একক । কর্নওয়ালিস-এর প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে ১৭৯২ সালে এই ইউনিটের উৎপত্তি হয় ।

৮. পুলিশ প্রশাসনের মৌলিক একক অর্থাৎ থানার প্রধান কর্মকর্তা । ১৭৯২ সালে উপনিবেশিক শাসকরা পদটি সৃষ্টি করে ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের পটভূমি

মুঘল আমল বা তারও আগে বাংলার রায়তের সার্বিক অবস্থা কেমন ছিলো — তা সঠিকভাবে নিরূপন করা কষ্টকর, তবে বিভিন্ন লেখক এবং গবেষকের তথ্য এবং বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুঘল যুগে *রায়ত* তথা কৃষক ভূমির অধিকারী ছিলো। *জমিদার* তাকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতো না, কারণ জমিদারও জমির মালিক ছিলো না। *জমিদার* ছিলো রাষ্ট্র নিযুক্ত বংশানুক্রমিক ভূমি রাজস্ব সংগ্রহকারী মাত্র। রাষ্ট্রীয় অনুমতি ছাড়া প্রজা উচ্ছেদ জমিদারের সাধ্যের বাইরে ছিলো; খাজনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও জমিদারের সাধ্যের মধ্যে ছিলো না। অর্থাৎ মুঘল আমলে *রায়ত* তথা কৃষক ছিলো ভূমির চিরস্থায়ী ভোগদখলদার; যদিও রাষ্ট্র ছিলো ভূমির সার্বভৌম মালিক (হবিব, ১৯৮৫: ১২২-২৩)। অন্যভাবে বলা যায় মুঘল আমলে *রায়ত* ভূমির চিরস্থায়ী ভোগদখলের সুবাদে ভূমির প্রকৃত মালিক হিসেবে অধিকার ভোগ করতো। আর ভূমির রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছিলো নিতান্তই সার্বভৌমত্বের প্রতীক (ইসলাম, ১৯৭৮: ১৪৪)।

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসক মঞ্চে উপবিষ্ট হয় এবং ১৭৬৩ সালে বক্সারের রণক্ষেত্রে মীর কাসিমকে পরাজিত করার *মধ্য দিয়ে* রাজনৈতিক আধিপত্য চূড়ান্ত করে। এই চূড়ান্ত আধিপত্যমূলক শাসন ও শোষণের কালো থাবার প্রথম শিকার হয় কৃষক তথা বাংলার গ্রামীণ সমাজ। অসন্তোষ দানা *বেধে* উঠে কৃষক সমাজে। কৃষক অসন্তোষের তীব্র ভাষা হয় প্রতিবাদের; শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহের অধ্যায়।

২.১ আঠার শতকের কৃষক আন্দোলন

ইতিহাস খ্যাত 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' বাংলার কৃষক সমাজের উদ্যোগে উপনিবেশিক শাসন-শোষণ বিরোধী প্রথম বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৬৩ সালে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত এ বিদ্রোহ বস্তুত একটা কৃষক বিদ্রোহ। তবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামকরণের পেছনে বিশেষ কারণ ছিলো।

মুঘল শাসনের মধ্যভাগ থেকেই বিহার ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বহু সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। কালক্রমে তাঁরা রীতিমত কৃষকে পরিণত হয়। কৃষকে পরিণত হয়েও সন্ন্যাসী ও ফকিরের পোষাক পরিধান করে তারা তাঁদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বছরের কিছু কিছু সময় দলবদ্ধভাবে তীর্থ ভ্রমণে বের হতেন। উত্তরবংগে তাদের বেশির ভাগ তীর্থক্ষেত্র ছিলো। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন এক দিকে কৃষক অপর দিকে সন্ন্যাসী ও ফকির। আর উভয় দিক থেকেই তাঁরা ব্রিটিশ বেনিয়া শাসক-গোষ্ঠীর শোষণের শিকার হয়েছিলেন। এ জন্য বিদ্রোহ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় (রায়, ১৯৮০: ২০-২১)। ফকির ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের লোকজনের নেতৃত্বে বাংলার প্রথম এই কৃষক বিদ্রোহকে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' বলার পেছনে— এটাই কারণ।

এই ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রমণ কালে বাংলা এবং বিহারে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীকে বেসামাল করে তুলেছিলো। ধ্বংসপ্রাপ্ত মুঘল সেনা বাহিনীর বেকার সৈনিকদের বহু সদস্যও ক্রমান্বয়ে এই বিদ্রোহে সামিল হয়। তাঁদের রণ-নৈপুণ্যে বিদ্রোহ আরো তেজী হয়ে উঠে। ঝড়ের গতিতে এই বিদ্রোহ বাংলা এবং বিহারের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। গেরিলা কৌশল, সম্মুখ সশস্ত্র যুদ্ধ, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ক্ষণেক বিরতি— এসব পর্বের মধ্য দিয়ে এ বিদ্রোহ অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। মজনু শাহ, দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক এবং আরো অনেকের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ১৮০০ সাল পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী তার দমনমূলক যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে কৃষকদের এই বিদ্রোহকে পরাস্ত করে (রায়, পূর্বোক্ত, ৫৩)।

গ্রামীণ সমাজের মূলে রয়েছে ভূমি। ভূমির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে গ্রামের সমাজ কাঠামোকে। ভূমিকে কেন্দ্র করে গ্রামের কর্মকান্ড এবং জীবন-ধারাও আবর্তিত হয়। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থার রূপ কী হবে তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের চরিত্রের উপর। ভূমির উপর ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাংলা তথা বাংলার গ্রাম সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এই প্রভাব গ্রামীণ জীবন ধারায় রীতিমত একটা সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকটের ফলে গ্রাম বাংলার ব্যাপক কৃষক সমাজ তীব্রতম শোষণের শিকার হয়। শোষণের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে উঠে কৃষকরা। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মূলত শাসক-গোষ্ঠী কর্তৃক কৃষক তথা গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিকে পাল্টে দেয়ার বিরুদ্ধে একটি কৃষক বিদ্রোহ।

অষ্টাদশ শতকে আরো বেশ কিছু শোষণ-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। কৃষক সমাজের এই প্রতিরোধগুলো ছিলো কোন কোন ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক; কোন কোন ক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিক। এগুলোর মধ্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৬-৮৩), শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪-৯৬) উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহগুলো ছিলো কৃষক সমাজের বঞ্চনা-বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এই শতাব্দির উল্লেখযোগ্য এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরো একটি আঞ্চলিক পর্যায়ের বিদ্রোহ হলো 'রংপুর বিদ্রোহ' (১৭৮৩)। এ বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো—

১৭৮০ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান হিসাবে দেবী সিংহকে নিয়োগ দেন। নাবালক রাজা এবং দেবী সিংহের দেওয়ান হিসেবে নিয়োগের পেছনে বেশকিছু ঘটনা ছিলো। আর এ ঘটনাগুলোর মধ্যদিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশিক শাসক-গোষ্ঠী বাংলার গ্রাম সমাজে কিভাবে সংকট সৃষ্টি করতো - তার একটা চিত্র পাওয়া যায় । ঘটনাগুলোর বিবরণে প্রথমেই 'নাবালক রাজার' প্রসংগটি চলে আসে। ১৭৮০ সালে দিনাজপুর মহারাজা বৈদ্যনাথ মারা যান । তাঁর কোন সন্তান ছিলো না । সন্তান না থাকায় উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি জটিল হয়ে যায় । রাণী স্বরসতী রাজার উত্তরাধিকার সমস্যা মীমাংসার জন্য 'দত্তক পুত্র' হিসেবে এক বালককে গ্রহণ করেন । বালকের নাম রাধানাথ। রাণী স্বরসতী বালক রাধানাথকে দিনাজপুরের জমিদারের (রাজা) উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করার জন্য গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর কাছে সনদ চেয়ে আবেদন করেন । আবেদন মঞ্জুর করা হয়— তবে এজন্য ৭৩০ মোহর (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) কোম্পানীকে উত্তরাধিকার বাবদ ফি দিতে হয়।

১৭৮০ সালেই রাজস্ব কাজে নাবালক রাজাকে সহযোগিতার জন্য এক হাজার টাকা বেতনে দেবী সিংহকে দেওয়ান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় । এই নিয়োগ দেয়া হয় কোম্পানির পক্ষ থেকে। কিন্তু নিয়োগের অব্যবহিত পরেই (১৭৮০ সালে) নাবালক রাজার অজুহাত দেখিয়ে দিনাজপুর রাজের সমস্ত জমিদারী দেবী সিংহকে ইজারা[১] দেয়া হয় (Siddiqui, 1972:32-33)।

দেবী সিংহ পশ্চিম ভারতের পানি পথের নিকটবর্তী এক গ্রামের বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোক। ভাগ্যান্বেষণে তিনি মুর্শিদাবাদে আসেন; এবং তৎকালীণ বাংলার ইংরেজ রাজের নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত পরিচিত হন । রেজা খাঁর অনুগ্রহে দেবী সিংহ পূর্নিয়ার *ইজারা* এবং তৎসংগে উক্ত প্রদেশের শাসনভার লাভ করেন । দেবী সিংহ কোম্পানী তথা ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর কাছ থেকে ষোল লক্ষ টাকার বন্দোবস্তে পূর্নিয়ার *ইজারা* গ্রহণ করেন (তার আগে পূর্নিয়ার *ইজারা* বন্দোবস্ত হতো নয় লক্ষ টাকায় এবং আদায় হতো সর্বাধিক ছয় লক্ষ টাকা)। এই টাকা আদায়ের জন্য কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় অবহণযোগ্য করের বোঝা । *রায়ত* বা কৃষকদের অপারগতাকে অগ্রাহ্য করে দেবী সিংহ কৃষকদের উপর ব্যাপক অত্যাচার করতেন । অনেক কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে যান । অত্যাচারের ফলে ঐ এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় (নিখিলনাথ রায় লিখিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' থেকে উদ্ধৃত, রায়, ১৯৮০: ১০৬)। এমতাবস্থায় দেবী সিংহকে ১৭৭২ সালে পদচ্যুত করে মুর্শিদাবাদে আনা হয় । ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সহায়তায় তাকে 'প্রাদেশিক রেভিনিউ বোর্ডের' কার্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ওয়ারেন হেস্টিংস তার নিজের সুবিধামত কয়েকজন ইংরেজ যুবকের সমন্বয়ে মুর্শিদাবাদে 'প্রাদেশিক রেভিনিউ বোর্ড' গঠন করেন। এখানে থাকা অবস্থায় দেবী সিংহ মুর্শিদাবাদ পরগনার আদায়কৃত রাজস্ব আত্মসাৎ করেন এবং নামে বা বেনামীতে বিভিন্ন স্থানের জমিদারীর বন্দোবস্ত নিয়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হন (পূর্বোক্ত, ১০৫-৭)। দেবী সিংহকে পদচ্যুত করার দাবী উঠলে ওয়ারেন হেস্টিংস্ দেবী সিংহকে বাঁচানোর জন্য 'রেভিনিউ বোর্ড' ভেঙ্গে দেন । এবং ১৭৮০ সালে দিনাজপুরে মহারাজার দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তাকে দিনাজপুর মহারাজার জমিদারী (দিনাজপুর এবং রংপুর পরগনা জুড়ে– এ জমিদারী) *ইজারা* বন্দোবস্ত দেয়া হয়। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। *ইজারা* গ্রহণের শুরু হয় দেবী সিংহের শোষন ও উৎপীড়ন। এলাকার জমিদার, প্রজা, নারী, পুরুষ কেউ দেবী সিংহের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের উপর অবিশ্বাস্য রকম করের বোঝা চাপিয়ে দেয়াতে তারা জমি হারালেন। আর সেই জমি নাম মাত্র মূল্যে কিনলেন দেবী সিংহ। কর আদায়ের নামে প্রজাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়া হয়; প্রজারা নিঃস্ব হলেন। ঋণের বেড়াজালে মহাজনদের ফাঁদে আটকে যান প্রজারা। হালের বলদ এবং অবশিষ্ট যা ছিলো তাও ঋণের চক্রবৃদ্ধির টাকা পরিশোধ করতে চলে যায়। কৃষকদের একটা বিরাট অংশ করের ভয় আর ঋণের জাল থেকে পরিত্রাণের জন্য এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু যাবার জায়গাও বিশেষ ছিলো না। শেষ পর্যন্ত বাঁচার রাস্তা হিসাবে উৎপীড়ক এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইকেই তারা বেছে নিলেন। দিনাজপুরের কুখ্যাত *ইজারাদার* দেবী সিংহের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ১৭৮৩ সালে সমগ্র রংপুর পরগনার[২] কৃষক প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

নুরুল উদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে কৃষকরা তাদের পরিচালক নির্বাচিত করেন এবং তাঁকে তারা 'নবাব' বলে ঘোষণা করেন। শুরু হয় বিদ্রোহ। দেবী সিংহের কর সংগ্রহকারীদেরকে তারা রংপুর এলাকা থেকে বিতাড়িত করেন। বহু কর্মচারীকেও হত্যা করা হয়। দেবী সিংহ রংপুরের ইংরেজ কালেক্টরের সহযোগিতা কামনা করলে - কোম্পানীর বিশাল এক সেনাবাহিনী রংপুরের বিদ্রোহ দমনের জন্য গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। নির্মম হত্যাযজ্ঞও চালানো হয়। বহু খন্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত এই কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয় ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী। কিছু দিন পর লর্ড কর্নওয়ালিশ গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন এবং *ইজারা প্রথা* রহিত করেন (রায়, পূর্বোক্ত, ১১০-১১২)। দেবী সিংহকেও পদচ্যুত করা হয়। পরবর্তীতে দেবী সিংহ ইংরেজ শাসকগণের দেয়া 'রাজা' উপাধি নিয়ে মুর্শিদাবাদের নসীপুরে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে বিলাশ-বহুল জীবন-যাপন করেন (রায়, পূর্বোক্ত, ১১২)। এদিকে ১৭৯২ সালে রাজা রাধানাথ *জমিদারী* ফিরে পান। কিন্তু প্রজা থেকে মোট আয়ের ৭২.৫% রাজস্ব কোম্পানীকে দেয়ার শর্তসাপেক্ষে। এটা রাজার পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব ছিলো। রাজস্ব পরিশোধ না করাতে তার 'রাজা উপাধির' সনদ কেড়ে নেয়া হয়। ১৮০১ সালে ২৪ বছর বয়সে রাজা রাধানাথ মারা যান (Siddique, Op. cit, 32)।

ইজারা প্রথা রহিতের পরই ১৭৯৩ সালে প্রবর্তন হলো কর্ণওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা কর্ণওয়ালিশের (১৭৯০-৯৩) প্রশাসনিক এবং আইনী সংস্কার পদক্ষেপেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা ভূমির উপর জমিদারদের

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো। *রায়ত* হলেন জমিদারের অধীনস্ত প্রজা। বাংলার সমাজ কাঠামো তথা স্তর বিন্যাসের ধরন পরিবর্তন হলো।

যা হোক এ বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার দাবী রাখে। এ পর্বের আলোচনায় কৃষক বিদ্রোহ তথা কৃষক আন্দোলনের বিষয়টি মূখ্য। তবে এটুকু বলা দরকার যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি ব্যবস্থায় সূচিত করে ব্যাপক পরিবর্তন। এই বন্দোবস্তে জমিদার[৩] জমির একচ্ছত্র মালিক। অর্থাৎ *জমিদার* শ্রেণী কৃষিভূমির মূল স্বত্বভোগী। আবার *জমিদার* শ্রেণীর অধীনে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু *জমিদার* শ্রেণীর সৃষ্টি করেনি, মধ্য-স্বত্বভোগী শ্রেণীরও জন্ম দিয়েছিলো। এ প্রেক্ষাপটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হতেই কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনে সংকটের এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। ইংরেজ শাসন, *জমিদার* গোষ্ঠী ও মধ্যস্বত্বভোগী– এই তিনটি শ্রেণীর শোষণের যাতাকলে পিষ্ঠ হলো বাংলার কৃষক (রায়, পূর্বোক্ত, ১৭৫)। এই পটভূমিতেই উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষক সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

২.২ উনিশ শতকের কৃষক আন্দোলন

ময়মনসিংহ পরগনায় কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), ময়মনসিংহের 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ (১৮২৫-২৭), ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ (১৮৩২-৩৩), ওয়াহাবী বিদ্রোহী (১৮৩১), ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৮)- উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কৃষক বিদ্রোহগুলোর মধ্যে অন্যতম (Kaviraj, 1982: 30-31)। এই বিদ্রোহগুলোর মাধ্যমে বাংলার কৃষক সমাজ উপনিবেশিক শাসন এবং ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের উল্লেখিত কৃষক বিদ্রোহগুলো বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কৃষক বিদ্রোহগুলোর ধারাবাহিকতায় মহিমান্বিত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত বাংলার কৃষক আন্দোলনগুলোর ধরনে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় প্রধানত খাজনার হার বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলনগুলো গড়ে উঠে (সেন, ১৯৯০:১০)। অবশ্য জমি থেকে উচ্ছেদ ও মহাজনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও কৃষক আন্দোলনগুলো বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেগবান হয়। এই আন্দোলন বা কৃষক বিদ্রোহগুলোতে সর্বস্তরের কৃষকরা জড়িয়ে পড়ে (সেন, পূর্বোক্ত, ৯-১০)।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কৃষক বিদ্রোহগুলোর মধ্যে, সাঁওতাল-বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), নীল-বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) এবং যশোরের নীল-বিদ্রোহ (১৮৮৯) উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত কৃষক বিদ্রোহগুলোর কোন কোনটি আবার অবিভক্ত বাংলার সীমানা পেরিয়ে উপনিবেশিক ভারতের অন্য প্রদেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করেছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতাল আদিবাসী কৃষকেরা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জমিদার, মহাজন ও ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাদের উদ্যোগে বিদ্রোহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ১৮৫৫-৫৬ সালের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। প্রধানতঃ মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হলেও খাজনার প্রশ্নটি সাঁওতালদের আলোড়িত করেছিলো (সেন, পূর্বোক্ত, ১১)। উল্লেখ্য যে, সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ যেখান থেকে শুরু হয় সে এলাকাটি মুর্শিদাবাদ এবং ভাগলপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থানে। এখানে তারা জংগল কেটে বসবাস শুরু করে। অল্পকালের মধ্যে এ এলাকায় বাংলা এবং বিহার থেকে আগত মহাজনরা চড়া সুদে টাকা ঋণ দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের শ্রমের ফসল ও সম্পত্তি হস্তগত করে নেয়া শুরু করে। সাঁওতালদের মনে মহাজনদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ও ক্ষোভ জন্মে। আর এই ক্ষোভেরই প্রকাশ ঘটে ১৮৫৫-৫৬ সালে ব্যাপক বিদ্রোহের মাধ্যমে।

সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ বস্তুত ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহে পরিণত হয়। শেষপর্যন্ত ইংরেজ সেনা বাহিনীর বিশাল বহর ছুটে যায় বিদ্রোহ দমনের জন্যে। বিশাল ইংরেজ সেনাবাহিনী আসার আগে সাঁওতালরা মহাজন, জমিদার এবং *পুলিশ দারোগাকে* এলাকা থেকে উৎখাত করেছিলো। তারা সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এক স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করার মনোভাব প্রকাশ করেছিলো (সেন, পূর্বোক্ত, ১১; রায়, ১৯৮৯: ৪৭)। ইংরেজ সেনাবাহিনী সমস্ত সাঁওতাল পরগনার উপর বিভৎস অত্যাচার ও ধ্বংসের তান্ডব সৃষ্টি করে সাঁওতাল বিদ্রোহকে আপাত দমন করে। বহু সাঁওতাল কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় অনেককে। ফৌজদারী আদালতের রায়ে অসংখ্য সাঁওতাল কৃষকের দীর্ঘ মেয়াদী সাজা হয়। সংগ্রামে সাঁওতালদের পরাজয় হলেও কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে এ বিদ্রোহ সূচনা করে এক নতুন অধ্যায়।

১৮৫৯-৬০ সালের 'নীল বিদ্রোহ' আরেকটি প্রধান কৃষক বিদ্রোহ। বাংলার মালদহ, পাবনা, নদীয়া, যশোর, মেদিনীপুর ও রাজশাহীতে ইংরেজরা নীল কুঠি স্থাপন করে। কৃষকদেরকে ধান, পাট ও তামাকের জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হয়। এই বাধ্য করার কৌশলটি সম্পর্কে বলা যায় যে নীলকররা নীল চাষের জন্য কৃষকদেরকে চুক্তিতে আবদ্ধ করতো। চুক্তি অনুসারে নীল চাষীদের দাদন অর্থাৎ অগ্রিম কিছু টাকা দেয়া হতো। উৎপাদিত নীলের দাম কৃষক বা নীলচাষী কী হারে পাবে— তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকতো। সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষ করতে হতো। ধান, পাট বা তামাক জমিতে আবাদ করলে সেগুলোর উপর লাঙ্গল চালিয়ে ফসল নষ্ট করে দেয়া হতো এবং কৃষককে নীল বুনতে বাধ্য করা হতো। বাধ্য হবার সংগে তাদের দাদনের বিষয়টি জড়িত ছিলো। কারণ চুক্তি অনুযায়ী ফসল উঠার পর দাদনের টাকা পরিশোধ করতে হতো— যা নীল চাষীদের পক্ষে সম্ভব হতো না। আর দাদনের টাকার বকেয়া পরিশোধের জন্য তাদেরকে আবার

Dhaka University Institutional Repository

নীল চাষ করতে হতো । এভাবে বছরের পর বছর ধরে কৃষকরা নীলকরদের দাদন আর নীল চাষের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হতো (সেন, ১৯৯০: ১৮; মজুমদার, ১৯৮১: ৭২-৭৩)। নীল চাষ কৃষকদের জন্য লাভজনক ছিলো না । যদিও নীলের উচ্চ বাজারদর ছিলো এবং নীলকররা খুবই লাভবান হচ্ছিলো। তাহলে নীল চাষীরা কেন লাভবান হচ্ছিলো না? প্রশ্নটার জবাব এ রকম–

বাজারে প্রতিমন নীলের দাম যখন সর্বোচ্চ ৩০ টাকা ছিলো তখন চুক্তি অনুসারে নীল চাষীকে দেয়া হতো মাত্র ৪ টাকা । তাছাড়া বীজের দাম, গাড়ী ভাড়া এবং চুক্তির সময় ব্যবহৃত স্ট্যাম্প-এর দামও নীল চাষীর কাছ থেকে কেটে নেয়া হতো। এ সব কারণে একজন চাষীর কাছে নীল চাষ লাভজনক ছিলো না । অন্য ফসল উৎপাদন করলে যে লাভ হতো— সে সম্পর্কে একটা হিসেবে দেখা যায়, একজন কৃষক তামাক উৎপাদন করে বিঘা প্রতি ১২ টাকা লাভ করে; এবং বিঘা প্রতি তামাকের জমিতে নীল চাষ করে সে ৯ টাকা লোকসান দেয় (সেন, ১৯৯: ১৮)। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে কৃষকদের জন্য নীল চাষ লাভজনক ছিলো না।

নীলকরদের শোষণে নীল চাষী তথা কৃষকের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়েছিলো যে, প্রতিবাদ ছাড়া তাদের কোন বিকল্প ছিলো না । আর তাই কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে । ১৮৬০ সালে নদীয়া, যশোর, পাবনা, রাজশাহী ফরিদপুর এবং মুর্শিদাবাদে নীল বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে । যশোরের কৃষকরা নীলকর জমিদারদের বিরুদ্ধে খাজনা বন্ধ আন্দোলনেরও সূচনা করেছিলো। এবং খাজনা বন্ধের এ আন্দোলন তিন মাসের মধ্যে পাবনা, নদীয়া এবং ফরিদপুরে ছড়িয়ে পড়েছিলো (সেন, ১৯৮৫, ১৮২) । উল্লেখ্য যে, ১৮৫৯ সালে রায়তের স্বার্থে একটি আইন হয় । এই আইনটির নাম 'খাজনা আইন' (Bengal Rent Act)। এই আইনের মূল বিষয় ছিলো: কোন *রায়ত* একনাগাড়ে ১২ বছর ধরে কোন জমি ভোগ দখল করলে— সে ঐ জমির 'দখলি স্বত্বের *রায়ত*' হিসেবে বিবেচিত হবে । এবং খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে সে জমিদারের কাছ থেকে *পাট্টা* পাওয়ার অধিকার পাবে এবং সে (রায়ত) যতদিন খাজনা দিয়ে যাবে—ততদিন পর্যন্ত তাকে জমিদার উচ্ছেদ করতে পারবে না (মজুমদার, ১৯৮১: ৯৩; সেন, ১৯৮৫: ১৮৩)।

এই আইন এড়াবার জন্য জমিদারগণ তাদের কাচারীতে রক্ষিত রায়তের দখলি স্বত্বের নথিপত্র নষ্ট করা শুরু করে এবং রায়তকে এক জমি থেকে উচ্ছেদ করে অন্য জমিতে নিয়ে যায় । খাজনার পরিমাণও উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দিতে থাকে (মজুমদার, ১৯৮১: ৯৩-৯৪)। হান্টারের উদ্ধৃতি থেকে সুনীল সেন লেখেছেন : খাজনা আইনের ফলে 'খাজনা' বৃদ্ধি ঘটেছিলো এবং যেখানে নীলকররা ভূস্বামী ছিলো সেখানে এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয় (সেন, ১৯৯০: ২০)।

Dhaka University Institutional Repository

খাজনা বৃদ্ধির বিষয়টি নীল বিদ্রোহে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো। যে কারণে নীল বিদ্রোহ ১৮৬০ সালে এক পর্যায়ে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সংগে মিশে গিয়েছিলো । নীল বিদ্রোহে সর্বস্তরের কৃষকরা উলেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলো। *তালুকদার,* ধনী কৃষক এবং নীল কুঠির কর্মচারীদের মধ্য থেকেই নেতা ও সংগঠকদের আবির্ভাব ঘটেছিলো (সেন, ১৯৯০: ১৯) ।

পাবনা এলাকায় ১৮৬০ সাল থেকেই খাজনা সংক্রান্ত বিক্ষোভ শুরু হয় । *জমিদার* শ্রেণী ঐ বিক্ষোভের তোয়াক্কা না করে উত্তরোত্তর খাজনার হার বাড়িয়ে দিতে থাকে । খাজনার সংগে বিভিন্ন প্রকার *আবওয়াব*[৪] আদায়, মিথ্যা জরিপের মাধ্যমে বাড়তি জমির খাজনা আদায় ইত্যাদি কৃষকের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো । এসব বিষয়ে কৃষক মুখ খুললে মিথ্যা মামলা দিয়ে এবং জমি থেকে উচ্ছেদ করে 'ঠান্ডা করার' পথ অবলম্বন করেছিলো *জমিদার* শ্রেণী । এমন একটা অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৮৬০ সাল থেকে চলে আসা কৃষক বিক্ষোভগুলি ১৮৭২-৭৩ এ একটা অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে (সেন, পূর্বোক্ত, ২১-২২)।

পাবনার এই কৃষক আন্দোলনের ফলে খাজনার প্রশ্নটি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো । ১৮৭৯ সালে খাজনা আইন কমিশন গঠন করা হয় এবং এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৮৮৫ সালে 'বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাশ হয় (পূর্বোক্ত, ২৩)। বস্তুত পাবনার কৃষক আন্দোলনের মূল ধারাই ছিলো জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার কৃষক আন্দোলনগুলোর ধরনে এবং চরিত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । *জমিদার* বিরোধী আন্দোলনের সাথে *জোতদার*[৫] বিরোধী অসন্তোষ যুক্ত হয় । আর তাই বহুমাত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের লড়াই দানা বেঁধে উঠে । ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনটির উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক । কারণ এই আইন প্রণীত হবার পূর্ব পর্যন্ত জমির উপর কৃষকের অধিকার কোন স্থিতিশীল রূপ পায়নি। এই আইনের ফলে *রায়তের* মালিকানা-স্বত্ব স্বীকৃত হয় । যদিও জমির খাজনা নির্ধারণের অধিকার জমিদারের হাতেই থাকে (রহমান ও আজাদ, ১৯৯০: ২৮-২৯, ৬৫)। ভূমি ভিত্তিক এই নতুন বিন্যাস বিশ শতকের প্রথমার্ধের কৃষক আন্দোলনের পটভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত।

বিশ শতকের গোড়া থেকে চল্লিশ দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলার কৃষক আন্দোলনগুলোর মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ (মালদহ-দিনাজপুর), ময়মনসিংহ জেলার হাজং কৃষকের টংক বিরোধী আন্দোলন এবং উত্তর বংগের তেভাগা আন্দোলন অন্যতম ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হবার পর ঢিলে-ঢালাভাবে চলা কৃষকদের পুরাতন সাংগঠনিক রূপ 'রায়ত সভার' কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। কারণ এই সংগঠনের প্রধান আকর্ষণ ছিল *রায়ত*। আর এই রায়তদের মধ্যে ছিলো ধনী কৃষক এবং বাংগালী জোতদারের মত অকৃষক মালিক (সেন, ১৯৮৫ : ১৯৯)।

২.৩ বিংশ শতকের কৃষক আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বেশ কিছু কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠে। এ সময়ে কৃষক আন্দোলনগুলো সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বাম রাজনৈতিক কর্মীদের ভূমিকা দেখা যায়। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অবিভক্ত বাংলায় খাজনা বন্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কৃষকরা বিশেষ করে ধনী কৃষকরা একযোগে আন্দোলন শুরু করে। বিশের দশকে 'প্রজা সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কৃষকদের *জমিদার* ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে। প্রয়োজনের তাগিদে কৃষককে সমস্যার আঙ্গিক বিচারে গড়ে উঠা এই সংগঠনের চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায় বাংলার কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত কর্মী ও সংগঠকরা। দিনাজপুর এবং মালদহের সাঁওতাল কৃষকরা *জমিদারের হাট-তোলা* এবং জোতদার-মহাজনদের শোষনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। কংগ্রেস তিরিশের দশকে যে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয় - তাতে সাড়া দিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। দিনাজপুর -মালদহের সাঁওতাল কৃষকদের আন্দোলনেও কংগ্রেসের আইন অমান্যের ডাক উৎসাহ যুগিয়েছিলো। কিন্তু কংগ্রেস কৃষকদের এসব আন্দোলন শুরু হবার পর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উৎসাহ দেখায়নি।

ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক মন্দা ও কৃষি পণ্যের দাম পড়ে যাওয়ায় কৃষকদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এমতবস্থায় বাংলা তথা ব্রিটিশ ভারতের কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু হয় এবং তারা 'কৃষক সভা'-কে সংগঠিত করার দিকে মনযোগ দেয় (সেন, ১৯৯০: ৪০,৪৯)। ১৯৩৫ সালে বাংলা এবং উপনিবেশিক ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে 'কৃষক সভা' গঠিত হলো। এই পটভূমিতে ১৯৩৬ সালে 'সারা ভারত কিষান সভা' গঠিত হয়। কিষাণ সভার গঠন পর্বেই কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্টদের প্রাধান্য বেশি ছিলো সর্বাধিক (সেন, পূর্বোক্ত, ৫২)। ১৯৩৬ সালেই বাংলার কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সারা ভারত কৃষক সভার অনুমোদনের মাধ্যমে 'বংগীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার' জন্ম হয়। এই কৃষক সভার নেতৃত্বেই তিরিশ দশকের শেষার্ধের আন্দোলন এবং চল্লিশের দশকের তেভাগা এবং অন্যান্য কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সালে উত্তর বংগের বর্গাদার বা *আধিয়াররা* তেভাগা আন্দোলন শুরু করে । এই আন্দোলনের মূল দাবী ছিলো আধিয়ারদের জন্য ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগের দাবী। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত 'কৃষক সভা' এই আন্দোলন সংগঠিত করেছিলো । তেভাগার দাবীর সংগে জমিদারী প্রথা বিলোপ এবং কৃষকের হাতে জমি ন্যস্ত করার দাবীও যুক্ত করা হয়েছিলো (সেন, পূর্বোক্ত, ৯০)।

জমি আর ফসলের অধিকার নিয়ে কোন সংগ্রাম কৃষকের মূল জীবন ভিত্তির সংগে সম্পর্কিত সংগ্রাম । এ ধরনের কোন সংগ্রামে কৃষকের জীবন ধারা, কৃষকের পরিবার, এমনকি সামগ্রিকভাবে কৃষক সমাজটাকেই একাত্ম হয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়। তে-ভাগা ছিলো তেমনি ধরনের একটি সংগ্রাম (সেন, ১৯৯৪: ১৮)। এই সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করে বাংলার উনিশটি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিলো (সেন, ১৯৯০: ৯০) । তেভাগা আন্দোলনকে দমনের জন্য পুলিশ ব্যাপক নির্যাতন চালায় । জোতদারগোষ্ঠীর[৫] স্বার্থরক্ষার জন্য পুলিশ দমনমূলক ব্যবস্থার সব কিছুই প্রয়োগ করে ।

২.৩.১ পাকিস্তান আমলে কৃষক আন্দোলন

১৯৪৭ সালে উপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো । বাংলার একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হলো । আর একটা অংশ ভারত রাষ্ট্রের অধীনে যায় । তেভাগা আন্দোলনের গতিময়তায় এ বিষয়টিও একটা বাধা হিসাবে দেখা দিলো । তবে আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় বর্গাদার বিলটি বাংলার আইন সভায় উত্থাপিত হয়েছিলো । যদিও নানা ষড়যন্ত্রের কারণে বিলটি তখন আইনে পরিণত হতে পারেনি ।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে *জমিদারী* উচ্ছেদ আইন পাশ হয়; জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপ হয় । এই আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং জমিদারী অধিকার সরকারের হাতে যাওয়াতে কৃষকদের সামনে আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু বিমূর্ত হয়ে যায় । গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় জমিদারদের স্থান দখল করে নেয় *জোতদার* ও ধনী কৃষক । ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হবার পর ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও জমিদারী উচ্ছেদ আইনে বর্ণিত জমির সিলিং ১০০ বিঘা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘা করা হলো । এতে জোতদারদের অবস্থান আরো দৃঢ় হলো । কিন্তু পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে কৃষক আন্দোলনের বাস্তবতা বিরাজ করলেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলন পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে উঠেনি । যদিও মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করার পর 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি' নামে কৃষকদের একটি সংগঠন

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তোলেন এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশাল বিশাল জনসমাবেশ করেন (উমর, ১৯৮৫: ১০-১২) ।

২.৩.২ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন

১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত কিছু অধ্যাদেশ জারি করে । যার মধ্যে অন্যতম ছিলো আইয়ুব ঘোষিত ৩৭৫ বিঘা আবাদি জমির সিলিংকে ১০০ বিঘাতে নামিয়ে আনা; নদী বা সমুদ্র থেকে জেগে উঠা চরকে সরকারী খাস জমি হিসেবে গন্য করা এবং এই সব খাস জমি ভূমিহীনদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া।

বাস্তবায়নের পদক্ষেপ বিচারে এগুলো নেহায়েত কাগুজে আইন হিসেবে পরিগণিত হয় । তবে এতে করে স্বাধীনতার পর বাংলদেশের গ্রামীণ সমাজের শ্রেণী বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন হয় । চল্লিশ দশক এমনকি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে *জোতদার* শ্রেণী হিসেবে যাদের স্পষ্ট অবস্থান এবং আধিপত্য ছিলো, সত্তরের দশকে এসে বাংলাদেশের গ্রামীণ স্তরায়নে তা অস্পষ্ট হয়ে যায় । ফলে গ্রাম সমাজে দ্বন্দ্বের রূপেও আসে ভিন্নতা ।

১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভূমি সংস্কারের কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয় । এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য ।

১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশে বেশ কিছু কৃষক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে । এসব আন্দোলনের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় চরের জমি দখলের জন্য ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন, পাবনার কিছু কিছু এলাকায় সরকারী খাস জমির জন্য ভূমিহীন কৃষকদের আন্দোলন এবং উত্তরের দিনাজপুর জেলার কিছু এলাকায় কৃষকদের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য (আজাদ ও শামসুজ্জোহা, ১৯৯১: ১৫-১৬) ।

এই আন্দোলনগুলোকে সংঘটিত করার ক্ষেত্রে দু'টো প্রক্রিয়া দেখা যায়। একটি রাজনৈতিক এবং অন্যটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কর্মীদের নেতৃত্বে (আজাদ, পূর্বোক্ত, ৯-১৩; Westergaard and Hossain, 1994:5) । উত্তর জনপদের রাণীশংকৈল এলাকার কৃষক আন্দোলনটি রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিচালিত হয় (হোসেন, ১৯৮৬ : ১৯৭)। পুলিশি নিপীড়ন এবং জেল জুলুমের মাধ্যমে আন্দোলনগুলোকে দমনের ব্যাপকতার বিষয়টি সাম্প্রতিককালের আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষনীয় । ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতের দীর্ঘ-সূত্রতার ব্যাপারটিও সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনগুলোকে নিস্প্রভ করার সংগে সম্পর্কিত।

Dhaka University Institutional Repository

পটভূমির দীর্ঘ এ আলোচনা থেকে বাংলার কৃষক আন্দোলনের ঐতিহ্যের পথ বেয়ে সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের গতিধারা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় । এই গতিধারা এবং সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপট সাম্প্রতিক গড়ে উঠা বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের পটভূমির সংগে গভীরভাবে সম্পর্কিত । তাই আন্দোলনের এই সামগ্রিক ও সাম্প্রতিক পটভূমির আলোকেই আমরা খুঁজবো রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ।

পাদটীকা

১. রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কোন পরগনা বন্দোবস্ত নেওয়ার ব্যবস্থা । ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহণকারীকে ইজারাদার বলা হয়। ইজারাদার তার ইচ্ছামাফিক খাজনা বৃদ্ধি করা এবং আদায় করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২. অনেকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে একটি এলাকাকে পরগনা বলা হতো । এই এলাকা রাজস্ব ও আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার একক।

৩. খাজনা আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত জমির মালিক । ১৯৭৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এই শ্রেণীটির স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বংশানুক্রমিক জমিদার শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃত হয় ।

৪. জমির খাজনা বহির্ভূত অতিরিক্ত কর । আবওয়াব অনিয়মিত কর যা কৃষকের কাছ থেকে জমিদাররা মাঝে মাঝে আদায় করতেন ।

৫. জমিদার ও রায়াতের মধ্যবর্তী অবস্থানের ধনী কৃষক । এই শ্রেণীর লোকজন সাধারণত গ্রামেই বসবাস করতেন । ব্রিটিশ শাসনামলের বাংলায় এই শ্রেণীর উৎপত্তি হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রাণীশংকৈলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

সমীক্ষাভুক্ত 'কৃষক আন্দোলন' এলাকাটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা আবশ্যক । কারণ এলাকাটির বৈশিষ্ট্যে এমন কিছু বৈচিত্র্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় যা আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিলো । যা হোক, আন্দোলন এলাকা তথা রাণীশংকৈল থানার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে এ অধ্যায়ের আলোচনার অবতারণা। অবশ্য রাণীশংকৈলের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ভৌগলিক অবস্থার আলোচনায় দিনাজপুর জেলা সম্পর্কিত কিছু বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় । তাই দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু বিষয় স্বাভাবিকভাবেই এসে যাবে এ অধ্যায়ের আলোচনায়।

হিমালয়ের হিমশীতল পরশে লালিত উত্তরের জনপদ দিনাজপুর । উত্তরে জলপাইগুড়ি (পশ্চিম বংগ), পশ্চিমে বিহার ও পশ্চিম দিনাজপুর (ভারত), দক্ষিণে পশ্চিম দিনাজপুরের কিয়দংশ ও বগুড়া এবং পূর্বে রংপুর দিয়ে বেষ্টিত এই জেলা।

দিনাজপুর জেলার মহকুমা [১] তিনটি, থানা তেইশটি । জেলার মোট জনসংখ্যা ৩১,৯৯,৯৬৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬,৫১,২০৮ এবং মহিলা ১৫,৪৮,৭৫৭ জন (BPC[২], 1981) । জেলায় শিক্ষার হার ২১.৬ । তথ্য থেকে দেখা যায় দিনাজপুর জেলায় পুরুষদের চেয়ে শিক্ষায় মহিলারা পিছিয়ে। পুরুষদের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার ৩০.৭ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার ১১.৮ (BPC, 1981)। দিনাজপুরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোক বসবাস করে । বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজনের শতকরা হার হিসেব থেকে দেখা যায় মুসলিম ৭৪.৮ ভাগ, হিন্দু ২৩.৬ ভাগ এবং বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য মিলে শতকরা ১.৫ ভাগ (BPC, 1981) । জেলায় মোট খানার পরিবার সংখ্যা ৫৮৫,১৩৪ টি । খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৪ জন। দিনাজপুর জেলার মোট আয়তন ২৫৩৫.৪ বর্গ মাইল । প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ১২৬১ জন (PBC, 1981: XXI; District Statistics, 1983) ।

দিনাজপুরের অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। ধান, পাট, আখ এবং মৌসুমী রবিশস্যের আবাদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হয়। শিল্প ক্ষেত্রে দিনাজপুর জেলা তুলনামূলকভাবে অনেক পিঁছিয়ে । বড় শিল্প কারখানার মধ্যে এখানে আছে একটি টেক্সটাইল মিল এবং তিনটি চিনির কল। এ ছাড়া বেশ কিছু ছোট শিল্প আছে । যেগুলোর মধ্যে রয়েছে রাইস মিল, আটার কল, স'মিল, প্রিন্টিং প্রেস এবং বেকারী । এবং কুটির শিল্পের মধ্যে আছে কিছু তাঁত শিল্প ।

Dhaka University Institutional Repository

জেলা শহরের সংগে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সড়ক পথ এবং রেল পথ । জেলা শহর থেকে থানা পর্যায়ে যোগাযোগ– ক্ষেত্রে বাস সার্ভিস আছে ।

দিনাজপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ৬২ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে রাণীশংকৈল থানার অবস্থান । ঠাকুরগাঁও মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত পাঁচটি থানার মধ্যে একটি হলো রাণীশংকৈল । ঠাকুরগাঁও শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত– এই থানার প্রতিবেশী থানাগুলোর মধ্যে রয়েছে হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গি এবং পীরগঞ্জ ।

রাণীশংকৈল থানার আয়তন ১১১.০ বর্গ মাইল । জনসংখ্যা ১২৩,০১৪ (BPC, 1981: LIII)। প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১০৯ জন । জনসংখ্যার আধিক্য বিচারে (Rank) রাণীশংকৈল থানা দিনাজপুর জেলার তেইশটি থানার মধ্যে এগারতম (BPC, 1981: LIII) স্থানে ।

রাণীশংকৈল থানায় রয়েছে পাঁচটি ইউনিয়ন । এগুলো যথাক্রমে– বাচোর ইউনিয়ন, ধর্মগড় ইউনিয়ন, হোসেন গাঁও ইউনিয়ন, লেহেম্বা এবং নেকমর্দ ইউনিয়ন।

বাচোর ইউনিয়নে মৌজার সংখ্যা ১৪টি, গ্রামের সংখ্যা ৭১ টি । এই ইউনিয়নে মোট ৩২৯২ টি পরিবার (খানা) বসবাস করে। ধর্মগড় ইউনিয়নে মৌজা ১০ টি এবং গ্রাম ৭৭ টি। এই ইউনিয়নে বাস করে ৫১৯১ টি পরিবার । হোসেনগাঁও ইউনিয়নে মৌজা ৪০টি (গ্রামও ৪০ টি) । ৬২০৩ টি পরিবারের আবাস এই ইউনিয়ন । লেহেম্বা ইউনিয়নে মৌজা ২১ টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৪১; এই ইউনিয়নে ৩১০৫ টি পরিবার বসবাস করে। নেকমর্দ ইউনিয়নে মৌজা ৩৭টি এবং গ্রামের সংখ্যাও ৩৭টি । ৪৭৯৭ টি পরিবার আছে এই ইউনিয়নে (BPC; 1981: 163) ।

রাণীশংকৈল থানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ২ টি কলেজ (সত্তরের দশকে কলেজগুলো হয়) । বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪ টি। সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৫৯ টি এবং মাদ্রাসা ৬ টি ।

রাণীশংকৈলের শিক্ষার হার সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে শতকরা ১৫.৭ জন শিক্ষিত । এই হার পুরুষদের বেলায় ২৪.১ এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৬.৬ জন (দেখুন, সারণী- ১)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ১ : রাণীশংকৈল থানার শিক্ষার হার সংক্রান্ত তথ্য (জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ের হার উল্লেখসহ)

এলাকা	মোট	পুরুষ	মহিলা
রাণীশংকৈল থানা	১৫.৭	২৪.১	৬.৬
দিনাজপুর জেলা	২১.৬	৩০.১	১১.৬
বাংলাদেশ (জাতীয়)	২৩.৮	৩১.০	১৬.০

Source : District Statistics, Dinajpur, 1983, BBS. Compiled from the tables, 5.03 and 5.04, p: 128-29.

Note -1: তথ্যগুলোর ভিত্তি ১৯৮১ সালের জনশুমারী রিপোর্ট ।

Note -2: The rate is estimated over total Population of age group 5 years and above

রাণীশংকৈলের শিক্ষার হার উল্লেখ আছে সারণী-১ এ । এবং পাশাপাশি দিনাজপুর জেলা এবং জাতীয় শিক্ষার হার সংক্রান্ত তথ্যগুলো রয়েছে । সারণীর তথ্য চিত্র থেকে দেখা যায় জাতীয় শিক্ষার হার (সম্মিলিত) যখন ২৩.৮, তখন দিনাজপুর জেলা এবং রাণীশংকৈল থানার শিক্ষার হার যথাক্রমে ২১.৬ এবং ১৫.৭ । দেখা যাচ্ছে জাতীয় হার থেকে দিনাজপুর জেলা এবং রাণীশংকৈল থানার শিক্ষার হার যথাক্রমে ২.২ এবং ৮.১ হারে কম । আবার দিনাজপুর জেলার গড় শিক্ষার হার (২১.৬) থেকে রাণীশংকৈলের শিক্ষার হার ৫.৯ কম । পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় শিক্ষার হার থেকে দিনাজপুর জেলার শিক্ষার হারের তারতম্য খুব বেশি নয়। কিন্তু রাণীশংকৈলের শিক্ষার হার জাতীয় হার থেকে এবং দিনাজপুর জেলার শিক্ষার গড় হার থেকে বেশ দূরত্বে অবস্থান করছে । এ থেকে এলাকাটির (রাণীশংকৈল) শিক্ষায় পশ্চাৎপদতার চালচিত্র স্পষ্ট হয় ।

নারী শিক্ষার তথ্যে রাণীশংকৈল থানার চিত্রটি আরো করুণ (দেখুন, সারণী-১)। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের হার জাতীয় পর্যায়ে ১৬.০ । দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রে এই হার ১১.৬ এবং রাণীশংকৈল থানায় নারী শিক্ষার হার ৬.৬ । এ সব তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয় হার থেকে দিনাজপুর জেলার নারী শিক্ষার হার ৪.৪ কম; রাণীশংকৈলের ক্ষেত্রে এই হার ৯.৪ কম ।

দিনাজপুর জেলার নারী শিক্ষার গড় হার থেকে রাণীশংকৈলের নারী শিক্ষার হার ৫.০ কম। উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে দেখা যায় যে, দিনাজপুর জেলা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে আছে। আর জাতীয় নারী শিক্ষার হার এবং দিনাজপুর জেলার নারী শিক্ষার হারকে বিবেচনায় আনলে দেখা যায় যে, রাণীশংকৈলে নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত সোচনীয় ।

Dhaka University Institutional Repository

রাণীশংকৈল থানার লোকজনের পেশা ভিত্তিক বিভাজন থেকে এলাকার কর্মকান্ড বা এলাকাটি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে । তাই এ আলোচনাটিও জরুরী। রাণীশংকৈল থানায় মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা (নারী-পুরুষ সমন্বয়ে) ৭৯,৪৮৪ জন (দেখুন,সারণী-২)। এই 'কর্মক্ষম' হিসাবটি দশ বছর এবং তার অধিক বয়সী লোকজনের হিসাবে (BPC, 1981: 573)।

সারণী-২ : রাণীশংকৈল থানায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন (দশ বছর এবং তদুর্ধ লোকজনের হিসাবে)

পেশার নাম	নিয়োজিত লোক সংখ্যা (জন)	পেশায় নিয়োজিত লোকদের শতকরা হার	
কৃষিকর্ম	২৬,৩৫৬	৩৩.১৬	৭২.৭৪
শস্য আবাদ বহির্ভূত কৃষিকর্ম (Agriculture Non-crop)	৬২৫	০.৭৮	
গৃহ কর্ম	৩০,৮৩৭	৩৮.৮০	
বেকার	৫,১০৯	৬.৪৩	
ছাত্র	৬,৫১২	৮.১৯	
শিল্প ক্ষেত্র (Manufacturing)	১০৭	০.১৩	২.০৮
ব্যবসা	১,৫৪৮	১.৯৫	
অন্যান্য	৮,৩৯০	১০.৫৬	
মোট	৭৯,৪৮৪	১০০	

Source : Bangladesh Population Census 1981, Zila Series, Dinajpur, BBS. Compiled from the table p14, p: 573.

সারণী-২ এর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, চাষাবাদের পেশায় নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ২৬,৩৫৬ জন— যা রাণীশংকৈল থানার মোট কর্মক্ষম লোকজনের ৩৩.১৬ ভাগ । শস্য-আবাদ বহির্ভূত কৃষিকর্ম বলতে গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মাছ ধরা (আয়ের উদ্দেশ্যে) এই ধরণের কাজকে বোঝায়। রাণীশংকৈল থানার মাত্র ৬২৫ জন লোক এ পেশায় নিয়োজিত ।

গৃহকর্মে সাধারণত মহিলারা নিয়োজিত; তবে পুরুষ জনসংখ্যার একটা অংশও এ পেশায় আছে । রাণীশংকৈলের তথ্য থেকে দেখা যায় গৃহকর্মে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ নিয়োজিত। বস্তুত এই পেশার লোকজন কৃষির সংগেই সম্পর্কিত। যা হোক, এই পেশায় মোট ৩০,৮৩৭ জন নিয়োজিত— যা রাণীশংকৈল থানার মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৩৮.৮০ ভাগ (দেখুন, সারণী-২) । কাজ নেই বা কাজ যোগাড় করা সম্ভব হচ্ছেনা— এমন সংখ্যাটিও রাণীশংকৈল থানায় কম নয় । ৫,১০৯ জন কর্মক্ষম লোক বেকার; যা রাণীশংকৈলের মোট কর্মক্ষম লোকের ৬.৪৩ শতাংশ (দেখুন, সারণী-২)।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (রাণীশংকৈল কিংবা বাইরে) ছাত্র হিসেবে ৬.৫১২ জন অধ্যয়নরত। এই সংখ্যাটি মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৮.১৯ ভাগ ।

রাণীশংকৈলের ছোট-খাট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত লোকের সংখ্যা মাত্র ১০৭ জন । আর ব্যবসা ক্ষেত্রে নিয়োজিত ১,৫৪৮ জন । অন্যান্য পেশায় (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, হাট-বাজার তদারকি, শহর পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে) নিয়োজিত ৮,৩৯০ জন। যা মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ১০.৫৬ ভাগ (দেখুন, সারণী-২) ।

রাণীশংকৈলের পেশা ভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, কৃষিকর্ম, গৃহকর্ম এবং আবাদ বহির্ভূত কৃষি— এই তিন পেশার লোকজন বস্তুত কৃষি পেশার সংগে জড়িত । তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রাণীশংকৈলের কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৭২.৭৪ ভাগ কৃষি পেশার সংগে যুক্ত (দেখুন, সারণী-২)। জাতীয় (বাংলাদেশ) হিসেব থেকে দেখা যায় কৃষি কর্মের সংগে শতকরা ২৪.০৭ ভাগ, গৃহ কর্মে ৩৭.৭৯ ভাগ এবং চাষ বহির্ভূত কৃষিকর্মে ০.৭৯ ভাগ লোক জড়িত। এই তিনটি পেশাকে কৃষিকর্ম হিসেবে বিবেচনায় আনলে দেখা যাবে জাতীয় হিসেবে কৃষিকর্মের সংগে জড়িত শতকরা ৬২.৬৫ ভাগ লোক।

শিল্প মালিক এবং শ্রমিক হিসেবে রাণীশংকৈলে কাজ করে ০.১৩ ভাগ লোক । আর ব্যবসা ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে ১.৯৫ ভাগ । কৃষির পাশাপাশি দাঁড় করালে শিল্প এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে রাণীশংকৈল যে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছে— তা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যায় ।

রাণীশংকৈল থানায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোকজন বসবাস করে । তথ্যে দেখা যায় মুসলিম শতকরা ৭৪.৮০ জন, হিন্দু ২৩.৭০ ভাগ (দেখুন সারণী-৩) । এছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর লোক শতকরা ১.৫০ ভাগ । রাণীশংকৈলের 'অন্যান্য' ধর্মাবলম্বী কলামে উল্লিখিত লোকেরা মূলত আদিবাসী রসাঁওতাল (প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট)।

হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বীর জাতীয় এবং দিনাজপুর জেলার তথ্যচিত্র থেকে রাণীশংকৈলের— এই তথ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । জাতীয় পর্যায়ের হিসেবে মুসলিম ধর্মাবলম্বীর লোক শতকরা ৮৬.৬৫ জন। আর রাণীশংকৈলে এই হার ৭৪.৮ (দেখুন সারণী-৩) ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩: রাণীশংকৈল থানার বিভিন্ন ধর্মের লোকসংখ্যার শতকরা হার (জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের হার উল্লেখসহ)

	জাতীয়	দিনাজপুর জেলা	রাণীশংকৈল থানা
মুসলিম	৮৬.৬৫	৭৫.৯০	৭৪.৮০
হিন্দু	১২.১৩	২১.৯০	২৩.৭০
বৌদ্ধ	০.৬১	০.০০	০.০০
খৃস্টান	০.৩২	০.৬০	০.৩০
অন্যান্য	০.২৯	১.৬০	১.২০*

Source : Bangladesh Population Census 1981, Dinajpur District, BBS, P: LVI, 483; BPC, 1981, Union Statistics, Nov. 1983, BBS, P:VII

- 'অন্যান্য' কলামে উল্লিখিত ১.২০% মূলত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোক ।

সারণী-৩-এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ের মুসলিম জনসংখ্যার হার থেকে রাণীশংকৈলের মুসলিম জনসংখ্যার হার ১১.৮৫ ভাগ কম । এবং দিনাজপুর জেলার গড় মুসলিম জনসংখ্যার হার ৭৫.৯০– যা জাতীয় হিসেবে থেকে ১০.৭৫ ভাগ কম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর লোকজন সমগ্র বাংলাদেশ বা জাতীয় পর্যায়ের হিসেবে শতকরা ১২.১৩ জন । দিনাজপুর জেলায় এই হার ২১.৯০ জন । এবং রাণীশংকৈলে ২৩.৭০ জন (দেখুন, সারণী-৩)। তথ্যগুলো থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার হিসেব থেকে রাণীশংকৈল থানায় বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীর লোক শতকরা ১১.৫৭ ভাগ বেশি । এবং দিনাজপুর জেলার গড় হিসেবে থেকে এই হার ১.৮০ ভাগ বেশি (দেখুন, সারণী-৩)।

ভূমিভিত্তিক তথ্য একটি এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য অনেকটা অপরিহার্য । তাই খামারের আয়তন, পরিবারের সংখ্যা, পরিবার পিছু জমি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য রাণীশংকৈলের ভূমিভিত্তিক বিন্যাসটি আলোচনায় আনা যেতে পারে (দেখুন, সারণী-৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪ : রাণীশংকৈল থানার ভূমিভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস

খামারের আয়তন (একরে)	মোট পরিবার (খানা) সংখ্যা	মোট জমির পরিমান (একরে)	পরিবার (খানা) পিছু গড় জমির পরিমান (একরে)	মোট আবাদী জমির পরিমান (একরে)	পরিবার (খানা) পিছু গড় আবাদী জমি (একরে)	জমির মালিকানা ভেদে পরিবার বা খানার শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পরিমাণ	২২৮৯১	৬৩৩৪৮	২.৭৭	৫৮৮৬০	২.৫৭	-
ভূমিহীন পরিবার	৬০২২	৩৯০	০.০৬	১০	০.০	২৬.৩০
মালিক পরিবার	১৬৮৬৯	৬২৯৫৮	৩.৭৩	৫৮৮৫০	৩.৪৮	৭৩.৬৯
০.০৫-০.৪৯	১৮১৮	৪৫০	০.২৪	৩৪৬	০.১৯	৭.৯৪
০.৫০-০.৯৯	১৪৪০	৯৯৯	০.৬৩	৮৯০	০.৬১	৬.২৯
১.০০-১.৪৯	১৭৪০	২০৫০	১.১৮	১৮৮৮	১.০৯	৭.৬০
১.৫০-২.৪৯	২৮৯৯	৫৬৬৪	১.৯৫	৫২৮১	১.৮২	১২.৬৬
২.৫০-৪.৯৯	৪৫৩৪	১৫৭০৯	৩.৪৬	১৪৮৪০	৩.২৭	১৯.৮২
৫.০০-৭.৪৯	২৩৩০	১৩৮২৮	৫.৯৩	১৩০৭০	৫.৬১	১০.১৮
৭.৫০-৯.৯৯	৯৩০	৭৮৬২	৮.৪৫	৭৪২৩	৮.৪১	৪.০৬
১০.০০-১৪.৯৯	৮১৭	৯৩৯০	১১.৪৯	৮৮০৯	১০.৭৮	৩.৫৭
১৫.০০-২৪.৯৯	৩১৯	৫৬১৮	১৭.৬১	৫২২১	১৬৩৭	১.৩৯
২৫.০০ একর+	৪২	১৩৮৮	৩৩.০৫	১০৮২	২৫.৭৬	০.১৯

Source: Govt. of Bangladesh, 1988, 'The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock 1984-89, Zila series, Thakurgaon, BBS. Compiled from the table 2.1, P: 49.

Note: ০.০৪ একর পর্যন্ত যে সকল খানার চাষের জমি আছে সেগুলোকেও ভূমিহীন ধরা হয়েছে।

সারণী-৪-এ দেখা যায় রাণীশংকৈল থানায় মোট খানার সংখ্যা ২২৮৯১ টি । মোট জমির পরিমান ৬৩৩৪৮ একর (কৃষি জমি + ভিটে জমি)। আবাদী জমির তথ্যে দেখা যায়, মোট আবাদী জমি ৫৮৮৬০ একর— যা রাণীশংকৈলের পরিবারগুলোর গড় হিসেবে পরিবার পিছু ২.৫৭ একর । ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ২৬.৩০ ভাগ। তবে ০.৪৯ একর পর্যন্ত জমির মালিককে ভূমিহীন ধরলে (যা সরকারী হিসেবে ধরা হয়) এ হার দাঁড়ায় ৩৪.২৪-তে (দেখুন, সারণী-৪)।

রাণীশংকৈল থানার খামারগুলোকে ছোট, মাজারী এবং বড়— এই তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে (দেখুন, সারণী-৪.১)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪.১: রাণীশংকৈল থানার ছোট, মাঝারী ও বড় খামার চিত্র

খামারের আয়তন (একর)	পরিবার (খানা) (শতকরা হিসেবে)	অধিকারভূক্ত জমি (শতকরা হিসেবে)
ভূমিহীন (০.০-০.০৪ একর)	২৬.৩০	০.৬২
মালিক পরিবার :	৭৩.৭০	৯৯.৩৮
ছোট খামার ((০.০৫-২.৪৯ একর)	৪৬.৮২	১৪.৪৬
মাঝারী খামার (২.৫০-৭.৪৯ একর)	৪০.৭০	৪৬.৬৩
বড় খামার (৭.৫০ একর এবং তদুর্ধ)	১২.৪৮	৩৮.২৯

উৎস : আলোচ্য অধ্যায়ের সারণী-৪.

মালিক পরিবারগুলোর খামারের হিসেবে দেখা যায়, ৪৬.৮২ ভাগ ছোট খামারে রাণীশংকৈলের মোট জমির ১৪.৪৬ ভাগ রয়েছে । মাঝারী খামারের সংখ্যা শতকরা ৪০.৭০ ভাগ। রাণীশংকৈলের মোট জমির ৪৬.৬৩ ভাগ মাঝারী খামারভূক্ত । আর বড় খামার শতকরা ১২.৪৮ ভাগ । বড় খামারভুক্ত জমি রাণীশংকৈলের মোট জমির ৩৮.২৯ শতাংশ।

রাণীশংকৈলের খামারের তথ্যচিত্রের সংগে বাংলাদেশের (জাতীয়) খামার হিসেবের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়। জাতীয় হিসেবে মালিক পরিবার ৭২.৭০ ভাগ (রাণীশংকৈলে ৭৩.৭০ ভাগ), ছোট খামার ৭০.৩৪ ভাগ (রাণীশংকৈলে ৪৬.৮২ ভাগ), মাঝারী খামার ২৪.৯২ ভাগ (রাণীশংকৈলের ৪০.৭০ ভাগ), বড় খামার ৪.৯৪ ভাগ (রাণীশংকৈলে ১২.৪৮ ভাগ)।

রাজনৈতিক ঐতিহ্যের আলোকে ১৯৪৬-৪৭-এর তে-ভাগা আন্দোলনের সংগে দিনাজপুর জেলার নামটি বিশেষভাবে জড়িত । দিনাজপুর জেলার রাণীশংকৈল থানাও আন্দোলন-উদ্বেলিত একটি এলাকা হিসেবে তে-ভাগা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত। রাণীশংকৈলে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও তে-ভাগার উত্তাল সংগ্রামে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলো । তে-ভাগার দাবীর পক্ষে লড়াই-এ অবতীর্ণ রাণীশংকৈলের মহিলাদের উপর পুলিশ গুলিও চালিয়েছিলো । পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলো ভান্ডানী নামে এক সংগ্রামী মহিলা, আহত হয়েছিলো তাঁর অনেক সাথী (তালুকদার, ১৯৮৮: ৭৭)। ভান্ডানী ছিলেন রাণীশংকৈলেরই এক কিষাণী বধু ।

যা হোক, রাণীশংকৈল থানার সাম্প্রতিক রাজনীতি সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে–রাণীশংকৈলের রাজনীতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রায় একচ্ছত্র অবস্থান ছিলো । তবে একই সময়ে ন্যাপ (ভাসানী)-এর বেশ কিছু কর্মী ও সমর্থনের সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশ আওযামী লীগ, ন্যাপ

Dhaka University Institutional Repository

(ভাসানী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি (অধুনা বিলুপ্ত) এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনৈতিক উপস্থিতি রাণীশংকৈলের রাজনীতিতে লক্ষণীয় । ১৯৮০ দশকে ডানপন্থী দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ— এই দলগুলোকে রাণীশংকৈলের রাজনীতিতে দেখা যায়।

বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আশির দশকে রাণীশংকৈলের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠে । এই সময় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কৃষক ফ্রন্ট রাণীশংকৈলের কৃষক সমাজের বহুমুখী সমস্যাকে চিহ্নিত করে এবং তার প্রতিবাদ জানায় আন্দোলন গড়ে তোলে।

রাণীশংকৈলের আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা থেকে এলাকাটি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া গেল । এখন আলোচ্য গবেষণার ক্ষেত্র 'রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন' যে চারটি গ্রাম/মৌজা থেকে বেগবান হয়েছিলো সে সম্পর্কিত কিছু তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন বেগবান হয়েছিলো চারটি গ্রাম থেকে । এই চারটি গ্রাম হচ্ছে, বাকস্যা সুন্দরপুর (বাচোর ইউনিয়নে), এই বলিদ্বারা, কলিগাঁও এবং উত্তরগাঁও, (এই তিনটি গ্রাম হোসেনগাঁও ইউনিয়নে)। চারটি গ্রামে মোট ৯১৭টি পরিবারের বাস (দেখুন, সারণী-৫)।

সারণী-৫: রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে আধিয়ার-কৃষকদের চার গ্রাম

মৌজা/গ্রাম	ইউনিয়ন	মোট খানার সংখ্যা	ভূমিহীন খানা	মালিক পরিবারের সংখ্যা	ছোট খামার মালিক পরিবার	মাঝারী খামার মালিক পরিবার	বড় খামার মালিক পরিবার	মোট আবাদী জমি (একর)	সেচভূক্ত জমির পরিমান (একর)
বাকসা সুন্দরপুর	বাচোর	১৩৩	২৮	১০৫	৬৭	৩৭	০১	২০৫	১৫ (৭.৩২%)
বলিহারা	হোসেনগাঁও	৩৩৫	১২০	২১৫	১১৩	৮৯	১৩	৫৯৫	৬৪ (১০.৭৬%)
কলিগাঁও	হোসেনগাঁও	১৯৭	৪৭	১৫০	৬৯	৬২	১৯	৫৫৮	১০১ (১৮.১০%)
উত্তরগাঁও	হোসেনগাঁও	২৫২	৪০	২১২	১১৫	৭৪	২৩	৬৬৪	৯৫ (১৪.৩০%)
চার গ্রাম (মোট)		৯১৭	২৩৫	৩৬৮২	৩৬৪	২৬২	৫৬	২২০২	২৭৫ (১৩.৭৪%)
রাণীশংকৈল থানা (মোট)		২২৮৯১	৬০২২	১৬৮৬৯	৭৮৯৭	৬৮৬৪	২১০৮	৫৮৮৬০	৬৬৮৮ (১১.৩৬%)

Source: Govt. of Bangladesh, 1988, 'The Bangladesh Census, of Agriculture and Livestock: 1983-84', Zila series Thakurgaon, Dhaka, BBS.
Compiled from the table 4.1, P: 93-96

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মোট ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ২৩৫টি, ছোট কৃষক পরিবার ৩৬৪টি । মাঝারী এবং বড় কৃষক পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ২৬২ ও ৫৬টি (দেখুন, সারণী-৫)।

রাণীশংকৈল থানার চারটি গ্রামের তথ্য বৈচিত্র্য বস্তুত রাণীশংকৈল এলাকারই প্রতিনিধিত্ব করে । রাণীশংকৈলের গ্রাম, গ্রামের কৃষক, তাদের সমস্যা, রাজনীতি, প্রতিবাদ আন্দোলন এবং সর্বোপরি রাণীশংকৈলের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার নির্যাসকে নিয়েই আবর্তিত হবে আলোচ্য গবেষণার আগত অধ্যায় ।

পাদটীকা

১. দিনাজপুর সদর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়— এই তিনটি মহকুমার প্রত্যেকটিকে ১৯৮৪ সালে জেলায় রূপান্তরিত করা হয় । রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনটি যখন শুরু হয় তখন মহকুমাগুলো জেলা হয়নি। তাই আন্দোলনের সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার তথ্যের দিকে নজর দিতে হচ্ছে ।

২. Bangladesh Population Census.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রাণীশংকৈলের আন্দোলন

পৌষের রোদমাখা পড়ন্ত বিকেল । কোলাহল-মুখর রাণীশংকৈল বন্দরের চৌরাস্তা মোড়। সাত মাইল দূরের নেকমরদ কিংবা চার মাইল দূরের কাতিহার হাট অথবা খোদ থানা সদরের গণ্যমান্য ও সাধারণ মানুষ। এদের সবার ভীড়ে জমে ওঠে বিকেলের চৌরাস্তা। দেশ ও দশের খবর নেয়া, দূর গ্রাম থেকে আসা বন্ধুজনের সংগে দেখা পাওয়া কিংবা নেহায়েত আড্ডার ছলে আসা— যে কারণেই হউক বিকেলের চৌরাস্তা যেন মিলন মেলার আকর্ষণ ।

চৌরাস্তার ভীড়ে অনেকের বিকেল কিংবা গোধূলি বেলার ঠিকানা; খোলা আকাশের নীচে উদয়ের চা অথবা গোপালের পান দোকান । কৃষক, দিনমজুর, রিক্সাচালক এবং ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের অনেকেই— এই চা দোকানের বেঞ্চে বসে কাটিয়ে যান কিছুটা সময় । আবার স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক কিংবা অন্যান্য চাকুরীজীবীদের চা পানের দৃশ্যও নিত্য দিনের । এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বারদেরকেও দেখা যায় চা-এর কাপ হাতে ।

১৯৮০ সালের প্রথম মাসের প্রথম রোববার । আধা-পান করা চায়ের কাপ রেখে একটা বেঞ্চ থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন কয়েকজন । একটু এগিয়ে উত্তরের রাস্তায় কী যেন দেখার চেষ্টা; কিন্তু দৃষ্টি আঁটকে যায় রাস্তার বাঁকে । ওভাবে কয়েকজনের উঠে যাওয়া এবং কিছু একটা তাকানোর দৃশ্য দেখে আরো কিছু লোক তাদের কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি? সমস্বরে জবাব, কান পেতে শুনুন, একটা আওয়াজ। ছন্দময় অথচ বজ্র কণ্ঠের আওয়াজ। সবাই কান পাতলেন । ওদিকে চৌরাস্তার দক্ষিণ প্রান্তেও গোপালের পান দোকান থেকে পান মুখে অনেকেই দক্ষিণের রাস্তার দিকে চেয়ে ভীড় করেছেন। দক্ষিণেও একই ধরণের আওয়াজ। অবাক বিস্ময়ে উত্তর এবং দক্ষিণের পথ চেয়ে হাজারো মানুষ । কোলাহলের চৌরাস্তা অনেকটা নিরব । রাস্তার বাঁক পেরিয়ে ফুটে উঠলো একটা বিশাল মিছিলের সম্মুখভাগ । ধীরে ধীরে মধ্যভাগ এবং শেষ না হওয়া পশ্চাদভাগ । গগণ-বিদারী শ্লোগান! *পুলিশ দারোগা গরু চোর, হুশিয়ার সাবধান। গরু চুরি বন্ধ কর, নইলে পুলিশ এলাকা ছাড়ো। তহসিলদার-কানুনগো, হুঁশিয়ার-সাবধান। কৃষকের ওপর অত্যাচার, বন্ধ কর বন্ধ কর । আধিয়ারদের ওপর অত্যাচার, রুখে দাঁড়াও কৃষক সমাজ ।*

উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে আসা মিছিল দু'টো চৌরাস্তার মোড়ে মিলিত হলো । শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত চৌরাস্তা। উথলে পড়া মানুষের ভীড়ে একটা বেঞ্চে দাঁড়িয়ে গেলেন একজন । প্রায় ধুলোমাখা লুঙ্গি-জামা পরিহিত এই লোকটি চৌরাস্তার লোকজনের কাছে একেবারেই অপরিচিত। এই লোকটি

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে আসা মিছিলের লোকদের একজন। নাম তাঁর জহর হোসেন । বাড়ি উত্তরগাঁয়ে । পেশায় একজন *আধিয়ার* কৃষক (দেখুন, পরিশিষ্ট-৪)। প্রথমেই গরু চুরি বন্ধ করার কথা বললেন পুলিশকে উদ্দেশ্য করে । তারপর সাব-রেজিস্ট্রার ও তহসিলদারদেরকে জমির জাল কাগজ-পত্র তৈরী থেকে সাবধান হতে বললেন । উত্তর গাঁয়ের *আধিয়ারদের* প্রতি পুলিশের অন্যায় আচরণ এবং পুলিশি জুলুমের কয়েকটি ঘটনাও তুলে ধরলেন । পুলিশ সব অনিষ্টের মূল- এমন ধারা বক্তব্য রেখে নেমে গেলেন জহর হোসেন ।

তারপরে বেঞ্চে উঠলেন উত্তর গাঁয়ের বড় কৃষক নন্দন । তিনি গরু চুরি প্রসংগে বললেন । তাঁর প্রতিবেশী *আধিয়ারদের* উপর পুলিশের চোখ রাঙ্গানো আচরণের কথাও তুলে ধরলেন। আরো বললেন, প্রতিবেশী *আধিয়াররা* শান্তিতেই ছিলেন । কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে তাঁরা বহু হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন। এ সব অত্যাচারের প্রতিকারও দাবী করলেন তিনি । আবু বকর বেঞ্চে উঠলেন। উত্তরের রাস্তা বেয়ে আসা মিছিলের একজন আবু বকর । পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সি আবু বকর একজন বড় কৃষক। তিরিশ বিঘা জমি নিজ হালে চাষ করেন (দেখুন, পরিশিষ্ট-৫)। কলিগাঁও গ্রামের এই কৃষক বক্তৃতার শুরুতে গরু-চুরি সম্পর্কে বললেন। এলাকায় গরু চুরির একটা হিসাবও দিলেন তিনি । তিনি তাঁর বক্তব্যে কৃষকের দুর্দশার জন্য দায়ী করলেন *পুলিশ-দারোগাকে* ।

তারপর বেঞ্চে উঠলেন সাধু হেমরম । বয়স প্রায় চল্লিশ । কুঁচকুঁচে কালো সুঠাম দেহী হেমরম আদিবাসী সাঁওতাল। হেমরম ছোট কৃষক । বলিদ্বারা এলাকায় বাড়ি (দেখুন, পরিশিষ্ট-৫)। হেমরম পুলিশকে চোর বললেন, ডাকাত বলতেও ছাড়লেন না। তার প্রতিবেশীর গরু চুরি হয়ে যাওয়ায় যে করুণ দশা হয়েছে - তা বর্ণনা করলেন। তীর-ধনুক নিয়ে তারা এখন হুঁশিয়ার আছেন- একথাও জানিয়ে দিলেন। চৌরাস্তার নীরব শ্রোতারা তীর-ধনুকের কথা শুনে একসংগে হো হো করে হেসে উঠলেন। সেদিকে নির্বিকার হেমরম বলিদ্বারার গরীব *আধিয়ারদের* জমি থেকে উচ্ছেদের কথাও তুলে ধরলেন এবং পুলিশ সবকিছুর গোড়া- একথা বলে তার বক্তব্য শেষ করলেন। সর্বশেষ বক্তা তসিরউদ্দীন। তসিরউদ্দীনের বাড়ি নয়নপুরে । তিনি হোসেনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং একজন বড় কৃষক। আগের বক্তাদের কথাগুলো তিনিও বললেন । সভা শেষ হলো । সভাস্থল থেকে শ্লোগান মুখরিত একটা বিরাট মিছিল উত্তরের কলেজ রোড দিয়ে অফিস পাড়া, শিবদিঘি এবং থানার দিকে এগিয়ে চললো।

Dhaka University Institutional Repository

চৌরাস্তার মিছিল এবং সমাবেশ রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের প্রারম্ভিক দৃশ্যপট। এই মিছিল এবং সমাবেশেই *আধিয়ার* কৃষকদের উৎকণ্ঠার বিষয়টি ব্যাপক পরিধিতে প্রথম উন্মোচিত হয় ।

ইতিমধ্যেই এটা স্পষ্ট রাণীশংকৈলের কৃষকরা উৎকণ্ঠিত। *আধিয়ার* কৃষকরা কোন্ কারণে উৎকণ্ঠিত? কি ধরনের সমস্যায় তারা জর্জরিত ? সমস্যার সূত্রপাত কিভাবে ঘটলো, কিভাবে সমস্যাটি আন্দোলনে রূপ নিলো — এ বিষয়গুলোর দিকে এখন দৃষ্টি ফেরানো যাক।

৪.১ সমস্যার সূত্রপাত

আধিয়ার কৃষকদের আবাদে থাকা চার মৌজার ৭১২ বিঘা জমি থেকে সমস্যাটির উৎপত্তি । এই জমিগুলোর মধ্যে ২৬৪ বিঘা বাক্সা সুন্দরপুর মৌজায়, ২১৬ বিঘা বলিদ্বারা, ১৭৪ বিঘা কলিগাঁও এবং ৫৮ বিঘা উত্তরগাঁও মৌজায়। চার গ্রামের ২২০ টি পরিবার এই জমির আবাদের সংগে জড়িত (১৯৮০ সালের হিসাব থেকে) ।

৪.১.১ আধিয়ার ও চার গ্রামের জমির ইতিহাস

আধিয়ার কৃষকরা অধিকাংশই গরীব কৃষক। কিছু পরিবার ভূমিহীন । গরীব বা ছোট কৃষক হিসেবে অল্প কিছু জমির মালিক হলেও আধিয়ারদের জীবিকার প্রধান উৎস *আধি* জমি। রাণীশংকৈল সদর থেকে মৌজাগুলোর দূরত্ব যথাক্রমে উত্তরগাঁও আড়াই মাইল (দক্ষিণ-পশ্চিমে), বাক্সা সুন্দরপুর প্রায় দুই মাইল (উত্তরে), বলিদ্বারা আড়াই মাইল (পশ্চিমে) এবং কলিগাঁও তিন মাইল (পশ্চিম-দক্ষিণে) (দেখুন, পরিশিষ্ট-৭)।

সমস্যাটিকে বোঝার জন্য চার *মৌজার* ৭১২ বিঘা জমির ইতিহাসের সাথে সাথে জমি আবাদের সংগে জড়িত আধিয়ারদের ইতিহাস সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে সমস্যাটি যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে-সে সম্পর্কিত তথ্য । তবে এ তথ্যের অনুসন্ধানে আমাদের যেতে হবে ১৯৪০-এর দশকে।

চল্লিশের দশক ছিলো *জমিদারী* ব্যবস্থা টিকে থাকার শেষ দশক; ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের ভারত ছাড়ার দশক; ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তির দশকও তা । এই দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাণীশংকৈলের বিশাল *জমিদার* বাড়ির জৌলুসে কোন কমতি ছিলো না। *জমিদারীর* দায়িত্বে তখন *জমিদার* শ্রীযুক্ত কর্মনাথ চৌধুরীর পুত্র টংকনাথ চৌধুরী। জমিদার টংকনাথ চৌধুরী। এই দশকেরই

Dhaka University Institutional Repository

গোড়ার দিকে *জমিদার* জামাতা গদা নাথ ঝাঁ পাটনা থেকে চলে আসেন দিনাজপুর শহরে । দিনাজপুর শহরে কয়েকটা বাড়ি এবং দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন থানায় কয়েক হাজার বিঘা জমির মালিক হয়ে যান গদা নাথ ঝাঁ। জমি এবং বাড়ির মালিক হতে তাঁকে সহযোগিতা দেন শ্বশুর মশায়; রাণীশংকৈলের জমিদার । আর তাঁর নিজের ইচ্ছা যে প্রবল ছিলো সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা । কারণ তিনি *জমিদারী সেরেস্তা* থেকে জমি পত্তন নেয়া ছাড়াও বহু জমি বহুজনের কাছ থেকে কিনেও নিয়েছিলেন । রাণীশংকৈলের চার মৌজার ৭১২ বিঘা জমির মালিকও ছিলেন এই গদা নাথ ঝাঁ । এই জমিগুলোর কিছু জমিদারী সেরেস্তা থেকে পত্তন নিয়ে এবং কিছু কবলা খরিদ করে তিনি মালিক হয়েছিলেন ।

চল্লিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই উপমহাদেশে রাজনৈতিক পালা-বদলের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেকের মতই আসন্ন রাজনৈতিক পরিণতি আঁচ করতে পারেন গদা নাথ ঝাঁ । পূর্ব ঠিকানা পাটনায় চলে যাবার চিন্তা করেন তিনি । ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং ভারত দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হলো । পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাগে পড়লো । হিন্দু জমিদার এবং অভিজাত শ্রেণীর সদস্য দাবীদার হিন্দুদের পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারত রাষ্ট্রে যাওয়া শুরু হলো। ঘর-বাড়ি, জমি-জমার সুরাহা করার জন্য ভারত রাষ্ট্র থেকে পূর্ব বাংলায় আসতে চাওয়া লোকদের সন্ধান করা হলো ।

গদা নাথ ঝাঁ পূর্ব বাংলা ছেড়ে যাওয়া হিন্দুদেরই একজন । তাঁর কয়েক হাজার বিঘা জমি এবং কয়েকটা বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের জন্য বহুজনের দরকার হলো । কয়েকজনকে পেয়েও গেলেন গদা নাথ ঝাঁ । পাটনার এ্যাডভোকেট সৈয়দ নূরুল হুদা ঐ কয়েকজনের মধ্যে একজন । ১৯৪৮ সালে স্ত্রী হাজেরা এবং একমাত্র সন্তান মাসুদাকে নিয়ে তিনি পাটনা থেকে দিনাজপুর শহরে চলে আসেন । রাণীশংকৈলের চার মৌজার ৭১২ বিঘা জমির মালিকানার ক্ষেত্রে গদা নাথ ঝাঁ-র আসনে আসীন হলেন এ্যাডভোকেট সৈয়দ নূরুল হুদা। সৈয়দ নূরুল হুদা দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক জমির মালিক হন। তবে তার অন্যান্য জমির প্রসংগটি এই মুহূর্তে আমরা আলোচনায় আনবো না।

৪.১.২ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে চার গ্রামের আধিয়ার

গদা নাথ ঝাঁ-র হাজার হাজার বিঘা জমির মধ্যে চার গ্রামের এই জমিগুলো চাষের লোক অভাবে প্রায় অনাবাদীই ছিলো । সৈয়দ নূরুল হুদা জমিগুলোর ঝাড়-জংগল পরিস্কার করে আবাদ করার চিন্তা করলেন । আবাদ করার জন্য লোকের সন্ধান করা হলো। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে ঝাড়-জংগল পরিস্কার

Dhaka University Institutional Repository

করে জমি আবাদ করার লোক দিনাজপুরে পাওয়া যাচ্ছিল না । তাই রাজশাহীতে লোক পাঠানো হলো সাঁওতালদের যোগাড় করার জন্য। সাঁওতালরা বন-জংগলের নিকট প্রতিবেশী। তাঁদের যোগাড় করতে পারলে ভাল হয়—এমন চিন্তা করেই তাদেরকে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়। ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ১২টা ভূমিহীন সাঁওতাল পরিবারকে আনা হলো । বাক্সা সুন্দরপুর এবং বলিদ্বারা মৌজার জমিতে তাদেরকে বাড়ি করার জন্য জমিও দেয়া হলো । তারা ঝাড়-জংগল পরিষ্কার করে আবাদ শুরু করলেন এবং সৈয়দ নূরুল হুদার নিয়োজিত প্রতিনিধিকে ফসলের অর্ধেক ভাগ নিয়মিতভাবে দিতে থাকলেন । ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলা থেকে আসলেন বেশ কিছু ভূমিহীন পরিবার। তাদেরকে কলিগাঁও মৌজায় বাড়ি করার সুযোগ দিয়ে কলিগাঁও-এর জমিগুলো আবাদের ব্যবস্থা করা হলো। প্রায় একই সময়ে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানা থেকে বেশ কিছু পরিবার যমুনার ভাংগনে সর্বস্বান্ত হয়ে রাণীশংকৈলে চলে আসে । এই পরিবারগুলোকেও উত্তরগাঁও এবং বলিদ্বারা মৌজার জমিতে আবাসিক সুবিধা দিয়ে *আধি* হিসেবে জমি আবাদের ব্যবস্থা করা হলো। এইভাবে সৈয়দ নুরুল হুদার প্রায় সমস্ত জমি ১৯৬১-৬২ সালে আবাদী জমিতে পরিণত হলো । বরাবরই আধিয়ার কৃষকরা ফসলের অর্ধেক ভাগ সৈয়দ নূরুল হুদাকে নিয়মিত দিয়ে যেতেন। এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দভাবে জমিগুলো আবাদ হয় ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত । ফসলের ভাগ-বন্টনের ক্ষেত্রে কোন রকম অসন্তোষ *আধিয়ার* কৃষক কিংবা জমির মালিকের মধ্যে ছিলো না ।

৪.১.৩ স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আধিয়ারদের সমস্যা

১৯৭১ সাল । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বছর । স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংগালী-অবাংগালী প্রশ্নটি স্বাধীনতার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ালো । পূর্ব বাংলার গ্রামে-গঞ্জেও এই সময় স্বাধীনতার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ চিহ্নিতকরণের প্রাথমিক মানদন্ড হলো বাংলা এবং উর্দু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী । অর্থাৎ বাংগালীরা স্বাধীনতার পক্ষে এবং অবাংগালীরা (আদিবাসী, উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকজন বাদে) স্বাধীনতার বিপক্ষে। এই বিভাজনের ব্যতয় ঘটেনি এ্যাডভোকেট সৈয়দ নূরুল হুদার ক্ষেত্রেও । কারণ সৈয়দ নূরুল হুদা ছিলেন পাটনা থেকে আগত অবাংগালী জনগোষ্ঠীর লোক । বস্তুত স্বাধীনতা যুদ্ধের বছর ব্যক্তি সৈয়দ নূরুল হুদার রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ হয়ে যায় গুরুত্বহীন । গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর অবাংগালী পরিচয় ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং নিজের অবাংগালী পরিচয় হিসেব করে সৈয়দ নূরুল হুদাকে পরিচিত লোকালয় দিনাজপুর ছেড়ে চলে যেতে হয় । আর তাঁর চলে যাওয়ার সংগে সংগে

Dhaka University Institutional Repository

রাণীশংকৈলের চার *মৌজার* ৭১২ বিঘা জমি অভিভাবক শূন্যতায় নিপতিত হয়। *আধিয়ার* কৃষকরা ফসলের ভাগ দেবার ক্ষেত্রে মালিক বিহীন হয়ে পড়ে ।

মাত্র নয় মাস চলেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হলো । স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো । শাসক বর্গের পরিবর্তন হলো । কিন্তু রাণীশংকৈলের চার *মৌজার* মালিক বিহীন জমিগুলো আবাদ বিহীন থাকলো না । জমিগুলো *আধিয়ার* কৃষকরা আগের মতই আবাদে রাখলেন, আমন ধান লাগালেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার মৌজার এই জমিগুলো পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক থেকেই *আধিয়ার* কৃষকরা আবাদ করছেন।

৪.২ স্বাধীনতার পর মধ্যস্বত্বের উত্থান

১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস । আমন ধান কাটা প্রায় শেষের দিকে। আসর আলী, মজনু, সাত্তার, মালেক ও খালেক— এই পাঁচজন উত্তরগাঁও গ্রামের *আধিয়ার কৃষক* সবুর আলীর বাড়িতে আসলেন । আসর আলীর বাড়ি উত্তরগাঁও সংলগ্ন রসুলপুর গ্রামে। মজনু ও সাত্তারের বাড়ি উত্তরগাঁয়ে। অবশ্য মালেক এবং খালেক উত্তর-গাঁও কিংবা রসুলপুরের নয় । তবে রাণীশংকৈল বাজারে সবুর আলী তাদেরকে বহুবার দেখেছেন । দু'জনই ক্ষমতাসীনদল[১] -এর ছোট-খাট নেতা । আর উত্তরগাঁয়ের তিনজনের মধ্যে আসর আলী একজন মধ্যবিত্ত কৃষক (দেখুন, পরিশিষ্ট-২)। অন্য দু'জনের মধ্যে একজন মধ্যবিত্ত কৃষক আসিফের ছেলে এবং অপরজন নকিবের ছেলে । নকিবও একজন মধ্যবিত্ত কৃষক। মজনু এবং সাত্তার দু'জনই বয়সে তরুন । আসর আলী, মজনু এবং সাত্তার তিনজনই একটা রাজনৈতিক দলের কর্মী । রাণীশংকৈল থেকে আসা মালেক ও খালেক তাদের নেতা।

সবুর আলীর সংগে পাঁচজনই দেশ-রাজনীতি এবং নানান বিষয়ে আলাপ করছেন। ইতোমধ্যেই *আধিয়ার* কৃষক মজু, হযরত, মহব্বত এবং মহব্বত আলীর কলেজ পড়ুয়া ছেলে জহর হোসেন এসে হাজির । তাঁরাও গল্পে সামিল হলেন । কিছুক্ষণ পর গল্পের ধরন পাল্টে গেল । আসর আলী এবং রাণীশংকৈল থেকে আসা মালেক এবং খালেকের আসার কারণটা স্পষ্ট হলো তখন, যখন তাঁরা *আধিয়ারদের* উদ্দেশ্যে বললেন, সৈয়দ নুরুল হুদা বিহারী মানুষ; তাঁর আর দিনাজপুরে আসার সম্ভাবনা নেই । তাই তাঁর জমিগুলো যাঁরা এতোদিন আবাদ করেছেন তারাই আবাদ করবেন । শুধু ফসলের একটা ভাগ দিতে হবে । এ বিষয়ে রাণীশংকৈলে মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডল তাদের সংগে আলাপ করেছেন একথাও জানালেন। রসুলপুরের আসর আলী এবং উত্তরগাঁয়ের মজনু ও সাত্তারকে

Dhaka University Institutional Repository

ফসলের ভাগ বুঝে দেয়ার কথা বলা হলো । *আধিয়ার* কৃষক সবুর আলী, মজু, হযরত এবং উপস্থিত অন্যান্য *আধিয়াররা* একথা শুনে অবাক । বিশেষত মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডলের নাম শুনে তারা বিস্মিত । কারণ এরা ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা। তাঁদের কথা অমান্য করার সাধ্য রাণীশংকৈলে কার আছে! অনেক চিন্তা-ভাবনার পর পরদিন বিকালে সবুর আলী, মজু, হযরত এবং আরো প্রায় ১২ জন *আধিয়ার-কৃষক* মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডলের সংগে দেখা করার জন্য রাণীশংকৈলে গেলেন । ফসলের ভাগ যেন না দিতে হয়- এ আলাপটা করা তাদের উদ্দেশ্য । অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা কথা বলার সুযোগ পেলেন মারফত প্রধানের সাথে । সব শোনার পর মারফত প্রধান বললেন, সৈয়দ নূরুল হুদাকে ফসলের অর্ধেক ভাগ দেয়া হতো- এখন যারা ভাগ চাচ্ছেন তাদেরকে অর্ধেকের কিছু কম দিলেও চলবে। তবে না দিলে চলবে না। এ কথা শোনার পর সবুর আলী এবং অন্যান্য আধিয়ার কৃষকরা চলে আসেন । তাদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ । কিন্তু তারা নিরূপায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসর আলী এবং তার সংগীদের চাপে ফসলের কিছু কিছু ভাগ দিতে তারা বাধ্য হলেন। তবে তিন ভাগের একভাগ বা তারও কিছু কম— এই হারে ফসলের ভাগ দেয়া হলো ।

১৯৭২ সালে উত্তর গাঁয়ের মত ঘটনা অন্য তিনটি *মৌজার আধিয়ারদের* ক্ষেত্রেও ঘটলো। বলিদ্বারা মৌজার আধিয়ারদের কাছ থেকে ফসলের ভাগ নিতেন সলিমউদ্দীন এবং তমিজউদ্দীন । দু'জনেরই বাড়ি বলিদ্বারা এলাকায় । সলিমউদ্দীন উচ্চবিত্ত কৃষক এবং তমিজউদ্দীন মধ্যবিত্ত কৃষক (দেখুন, পরিশিষ্ট-১ ও ২)। দু'জনই ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা । কলিগাঁও মৌজার *আধিয়ারদের* কাছ থেকে ফসলের ভাগ আদায় করতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের চেলা হোসেন এবং তার সংগে আরো কয়েকজন । চেলা হোসেন একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক । তবে ক্ষমতাসীন দলের একজন ভালো সমর্থক (দেখুন, পরিশিষ্ট-১ ও ২)। আর বাক্সা সুন্দরপুর *মৌজার আধিয়ারদের* কাছ থেকে ফসলের ভাগ নিলেন সাগরেদ আলী । সাগরেদ আলীর বাড়ি বাচোর ইউনিয়নে । একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক এবং ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক (দেখুন, পরিশিষ্ট-১)।

রাণীশংকৈলের চার *মৌজার* ৭১২ বিঘা জমির উপর নতুন করে মধ্যস্বত্বের সূত্রপাত বা উত্থান হয় এভাবে—১৯৭২ সালে । এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমন ফসলের ভাগ নেয়া পর্যন্ত এই মধ্যস্বত্ব অবস্থা বহাল ছিলো। ১৯৭৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে ক্ষমতার দৃশ্যপট পরিবর্তন হলো। রাণীশংকৈলের রাজনীতি এবং ক্ষমতা কাঠামোতেও স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়লো । এবং এই প্রভাবের পরিনতিতে মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীর লোকজনের পক্ষে পূর্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হলো

Dhaka University Institutional Repository

না। অর্থাৎ এই মধ্যস্বত্বভোগী লোকজনের ক্ষমতার উৎসে ব্যাঘাত ঘটায় তারা মধ্যস্বত্ব অবস্থান থেকে সাময়িকভাবে সরে দাঁড়ালেন ।

৪.৩ ১৯৭৫ পরবর্তীতে মধ্যস্বত্বের পুনরুত্থান

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী ছিল ক্ষমতাসীন দলেরই একটা শক্তিশালী অংশ । তাদের মধ্যস্বত্ব দাবীর যুক্তি ছিলো 'ক্ষমতা' । কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতার পালাবদলে অন্য একটি ক্ষমতা গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে ।

স্বভাবতই রাণীশংকৈলের রাজনীতি তথা ক্ষমতা চর্চায় নতুনভাবে আবির্ভূত গোষ্ঠীর স্থানীয় প্রতিনিধিদের পূর্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা । বিশেষ করে চার মৌজার আধিয়ারদের কাছে মধ্যস্বত্বভোগী নতুন গোষ্ঠীটির আবির্ভাব না হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতায় সে হিসেব মিললো না। রাণীশংকৈলের চার মৌজার মধ্যস্বত্বের বিষয়টি এই সরল হিসেবে চলেনি ।

১৯৭৫ পরবর্তীকালে মধ্যস্বত্বের পুনরুত্থান বহু আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে ঘটলো। এই বিষয়টিই এখানে আলোচনা করা হবে । তবে তার আগে চার *মৌজার* জমিগুলোকে কেন্দ্র করে আরো কিছু ঘটনা ঘটে- সেগুলো সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার । এই ঘটনাগুলো পঁচাত্তর পরবর্তীকালে মধ্যস্বত্বের পুনরুত্থানের সংগে বেশ সম্পর্কিত ।

৪.৩.১ একসনা বন্দোবস্তে আধিয়ার কৃষক

১৯৭২ সালে ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত একটা অধ্যাদেশ জারি হলো । এই অধ্যাদেশ ১৯৭২ সালে ভূমি সংস্কার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশ নামে পরিচিত। এই অধ্যাদেশের মূল বিষয় ছিলো আইয়ুব আমলের পরিবারপিছু ভূমি সিলিং ৩৭৫ বিঘা থেকে ১০০ বিঘাতে নামিয়ে আনা । এবং এ ১০০ বিঘাতে নামিয়ে আনার ফলে যে উদ্বৃত্ত জমি বেরিয়ে আসবে তা সরকারের অর্পণ করার ব্যবস্থা করা । এজন্য জমির হিসেব সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য দেশের সর্বস্তরের ভূমি অফিসগুলোতে একটা সার্কুলারও দেয়া হলো । এমন একটা সার্কুলার রাণীশংকৈলের ভূমি অফিসেও আসলো । এই সার্কুলারের ভিত্তিতে রাণীশংকৈলের ভূমি অফিস ব্যস্ত হয়ে উঠলো । এলাকার লোকজনকে ছাপানো ফরম দেয়া হলো জমির হিসেব দেয়ার জন্য । এলাকার লোকজন জমির হিসেব দিলেন । কিন্তু চার *মৌজার* (পূর্বে উল্লিখিত চার মৌজা) ৭১২ বিঘা জমির কোন হিসেব কেউ দিলেন না। বিষয়টি রাণীশংকৈল ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নজরে পড়ে গেলো ।

Dhaka University Institutional Repository

জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র ঘেটে তাঁরা জমিগুলোর মালিক হিসেবে ১২ জনের নাম পেলেন। ১৯৭৪ সালে ভূমি অফিসের একজন কর্মকর্তা চার গ্রাম তদন্ত করলেন। তদন্তে দেখা গেলো চার গ্রামের *আধিয়াররা* জমিগুলো আবাদ করছেন এবং *আধিয়াররা* এই জমিগুলোর মালিক হিসেবে অবাংগালী সৈয়দ নুরুল হুদাকে জানেন। অথচ জমির কাগজ-পত্রে মালিক হিসেবে সৈয়দ নূরুল হুদা, তাঁর স্ত্রী হাজেরা খাতুন এবং মেয়ে মাসুদা খাতুন ছাড়াও ৯ জনকে দেখা যায়। যেহেতু এই ১২ জনের মধ্যে কেউ জমির হিসেব দিতে আসেননি সেহেতু ধরে নেয়া হয় যে, ১২ জন মালিকই অবাংগালী এবং তারা এই এলাকায় নেই। এই বিবেচনা থেকে জমিগুলোকে অবাংগালীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঠাকুরগাঁও মহকুমা প্রশাসকের অফিসে একটা নোট পাঠানো হলো।

১৯৭৫ সালের শেষের দিকে ঠাকুরগাঁও মহকুমা প্রশাসকের অফিস থেকে জমিগুলোকে *একসনা বন্দোবস্তের* মাধ্যমে আবাদ করার নির্দেশ দেয়া হলো। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাণীশংকৈল ভূমি অফিস থেকে *একসনা বন্দোবস্ত* নেয়ার জন্য *আধিয়ারদেরকে* জানানো হলো। এ বিষয়টি *আধিয়ারদের* মধ্যে নানান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। তবে মধ্যস্বত্বের উৎপাত বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভূমি অফিস থেকে একসনা বন্দোবস্ত নিয়ে আবাদ করার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ *আধিয়ারের* কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো। এবং একসনা বন্দোবস্ত *আধিয়ার* কৃষকদের অনেকেই নিলেন। *একসনা বন্দোবস্ত* নেয়ার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা ব্যবস্থা হতে পারে— এমন একটা আশ্বাসও তারা ভূমি অফিস থেকে পেলেন। যা হোক, ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে এই একসনা বন্দোবস্ত নিয়ে তাদের দীর্ঘ দিনের আবাদে থাকা জমিগুলো পুনরায় আবাদ করলেন।

৪.৩.২ একসনা বন্দোবস্ত ও মধ্যস্বত্ব উত্থানের ষড়যন্ত্র

১৯৭৬ সাল। আবার *একসনা বন্দোবস্ত* নেয়ার সময় হলো। কিন্তু ১৯৭৬ সালে আধিয়াররা *একসনা বন্দোবস্তের* ব্যাপারে ভূমি অফিসে এসে হতাশ হলেন। ভূমি অফিস থেকে বলা হলো নতুন নির্দেশ আসেনি। ১৯৭৭ সালে ভূমি অফিস থেকে আবার বলে দেয়া হলো *একসনা বন্দোবস্ত* দেয়ার কোন নির্দেশ আসেনি। চার *মৌজার* আধিয়াররা ১৯৭৭ সালেও নির্বিঘ্নে জমি আবাদ করে ফসল ঘরে তুললেন। মধ্যস্বত্বভোগীর কোন উৎপাত নেই; নেই *একসনা বন্দোবস্তের* ঝামেলা— এইভাবে কেটে গেল ১৯৭৭ সাল।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি পুনরুল্লেখ হলেও বলা দরকার যে, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগী লোকজনের শক্তির উৎস ছিলো দলীয় ক্ষমতা । এবং ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের দলের সংগে জড়িত থাকা । অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীদের ঐ অবস্থানটির কারণেই আধিয়ার কৃষকরা ফসলের ভাগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । পরিবর্তিত সময় এবং পরিস্থিতিতে মধ্যস্বত্ব দাবীর পূর্বোক্ত বাস্তবতা আর ছিলো না ।

তাহলে মধ্যস্বত্বের অবসান হলো কি? না, বস্তুত মধ্যস্বত্বের অবসান হয়নি । বরং মধ্যস্বত্ব নতুন আঙ্গিকে আবিভূত হলো। এখন মধ্যস্বত্বের পুনরাবির্ভাবের এই আঙ্গিকটা কি—সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ।

রাণীশংকৈল ভূমি অফিস থেকে ১৯৭৪ সালে মহকুমাস্থ ভূমি দপ্তরে একটা নোট পাঠানো হয়েছিলো এবং ঐ নোটের প্রেক্ষিতে চার মৌজার ৭১২ বিঘা জমি *একসনা বন্দোবস্ত* দেবার নির্দেশ আসে। ১৯৭৫ সালে *একসনা বন্দোবস্ত* দেয়া হয়। আবার ১৯৭৬ সালে *একসনা বন্দোবস্ত* দেয়া হয় নি এবং ১৯৭৭ সালেও বন্দোবস্ত দেয়া হলো না । বস্তুত এই একসনা বন্দোবস্ত প্রকৃত পক্ষে মধ্যস্বত্বের বিপরীত এবং কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত ব্যর্থ হবার প্রতিশ্রুতি। পক্ষান্তরে কায়েমী স্বার্থবাদ, তহসিলদার, থানা ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এই প্রক্রিয়াকে বাধা দিয়েছে ।

রাণীশংকৈল ভূমি অফিসের *তহসিলদার* নোমান । বাড়ি দিনাজপুর শহরে । পাকিস্তান আমলেই নোমানের চাকুরী হয়। চাকুরী নেয়ার সময় দিনাজপুর শহরে তার বাড়ি ছিলো না। বাড়ি ছিলো দিনাজপুর শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে একটা গ্রামে । তখন তার সামাজিক অবস্থান ছিলো নিম্নমধ্যবিত্ত। স্বাধীনতার পর দিনাজপুর শহরে বাড়ি হলো । বেশ কিছু জমি-জমাও হলো । সামাজিক মর্যাদার উত্তরণ ঘটলো । সামাজিক মর্যাদাগত অবস্থান হলো মধ্যবিত্ত । নোমান রাণীশংকৈলে *তহসিলদার* হয়ে আসেন ১৯৭০ সালে এবং ১৯৮০ সাল পর্যন্ত রাণীশংকৈলের ভূমি অফিসে চাকুরী করেন ।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর জমি-জমার হিসেবে চেয়ে যে সার্কুলারটি এসেছিলো (এ সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে) — তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে *তহসিলদার* নোমানের উপর । অর্থাৎ সার্কেল অফিসার (রেভিনিউ) *তহসিলদার* নেমানকে লোকজনের জমি-জমার হিসাব নেয়ার দায়িত্ব দেন । এই সময় নোমান ভালভাবে জেনে নেন চার *মৌজার* ৭১২ বিঘা জমি সম্পর্কে । যা সৈয়দ নূরুল হুদার জমি নামে *আধিয়ার* কৃষক এবং অন্যান্যরা জানতেন । নোমান ঐ জমিগুলোর ১২ জন মালিক পেলেন । জমিগুলো সম্পর্কে তাঁর অফিসের বড় কর্তাকে জানালেন । এবং জানানোর পরেই

Dhaka University Institutional Repository

জমিগুলো সম্পর্কে একসনা বন্দোবস্তের নির্দেশ আসলো মহকুমা প্রশাসকের অফিস থেকে। ১৯৭৬ সালে সার্কেল অফিসার (রেভিনিউ) বদলি হয়ে চলে গেলেন অন্যত্র। আসলেন আর একজন অফিসার।

একদিন নোমানের কাছে আসলেন হোসেনগাঁও ইউনিয়নের সলিমউদ্দীন। সলিমউদ্দীন উচ্চবিত্ত সামাজিক অবস্থানের লোক (দেখুন, পরিশিষ্ট-২)। *তহসিলদার* নোমানের সংগে তাঁর অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। এক পর্যায়ে সৈয়দ নূরুল হুদার চার *মৌজার* জমির প্রসংগটি আলোচনায় আসলো। নোমান ঐ জমির ১২ জন মালিক এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করলেন। জমিটা এখন *একসনা বন্দোবস্ত* ব্যবস্থায় আছে; তবে জমিটা রাষ্ট্রীয় জমি হিসাবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি, কেবল মহকুমা অফিস পর্যন্ত জমিটা সম্পর্কে জানাজানি হয়েছে— এ বিষয়গুলো আলোচনা হলো। এসব আলোচনার পর সলিমউদ্দীন চলে গেলেন। সলিমউদ্দীন এবং অন্যান্য কয়েকজনের মধ্যস্বত্বে ১৯৭৫ পর্যন্ত এ জমিগুলো ছিলো। এ জমি থেকে তাদের অনেক আয় হয়। এ জমিতে মধ্যস্বত্ব কায়েমের জন্য তাদের নেতা মারফত প্রধান কিংবা সারাফত মন্ডলের একটা বাক্যই যথেষ্ট ছিলো (দেখুন, পরিশিষ্ট-১)। এমন অনেক বিষয় এবং ১৯৭৫ পূর্ববর্তী দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় সলিমউদ্দীনের।

চার *মৌজার* জমির বিষয়টি আবার আলোচনার জন্য সলিমউদ্দীন একদিন তমিজউদ্দীনের বাড়িতে গেলেন। তমিজউদ্দীনের বাড়ি তাঁর বাড়ি থেকে একমাইল দূরে এবং একই ইউনিয়নে। সলিমউদ্দীন নিভৃতে তমিজউদ্দীনের সংগে আলাপ করলেন। *তহসিলদার* নোমানের কথা বললেন। তারপর দুজনেই মারফত প্রধানকে বিষয়গুলো জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মারফত প্রধানের সংগে তাদের প্রায় প্রতি সপ্তাহে দেখা হয়। ঠিক হলো গভীর রাতে মারফত প্রধানের বাড়িতে আলোচনা করা হবে। এসব বিষয় কেউ জেনে গেলে সমস্যা, তাই গভীর রাতের প্রসংগটি আসলো। মারফত প্রধানের সংগে দিনক্ষণ ঠিক হলো। মারফত প্রধানও রাতে আলোচনার সময়টাকে প্রাধান্য দিলেন।

আলোচনা শুরু হলো। সলিমউদ্দীন চার *মৌজার* সৈয়দ নুরুল হুদার জমি সংক্রান্ত তথ্য দিতে শুরু করলেন, ১২ জন মালিকের কথাও বললেন; জমিগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও আলাপ হলো। মারফত প্রধানের মনে পড়ে যায় ১৯৭৫ পূর্ব আধিপত্যের দিনগুলোর কথা। কিন্তু সময় পাল্টেছে, আগের কৌশল অচল। মারফত প্রধানের এমনতর মন্তব্যে সায় দিলেন সবাই। মারফত প্রধান আরো বললেন, *তহসিলদার* নোমানের সহযোগিতায় যদি করা যায় তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না; *তহসিলদার* বা ভূমি অফিসের সহযোগিতা ছাড়া এসব ভেবে খুব একটা লাভ হবে না। সিদ্ধান্ত হলো তহসিলদার নোমানের সংগে আলাপ করার। দায়িত্ব নিলেন সলিমউদ্দীন।

Dhaka University Institutional Repository

তহসিলদার নোমান আলাপে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ দেখালেন । সময় ঠিক করা হলো । সময়মত বসাও হলো । তহসিলদার নোমান তার অভিজ্ঞতার নিরিখে অনেক কিছু বললেন । চার *মৌজার* জমিগুলো গত বছর একসনা বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিলো - সে কথাও বললেন । আরো বললেন, কিছু করতে হলে আগে এই একসনা বন্দোবস্ত দেয়া বন্ধ করতে হবে । এবং এটা তার পক্ষে সম্ভব । *একসনা বন্দোবস্ত* দেয়া বন্ধ না করলে *আধিয়ারদের* মালিকানা সম্পর্কিত যুক্তি শক্তিশালী হবে— এ কথাটায় নোমান খুব জোর দিলেন।

তহসিলদার নোমান কাজ শুরু করলেন । বদলি হয়ে আসা অফিসের বড় কর্মকর্তাকেও বিষয়টি জানালেন । বড় কর্মকর্তা *একসনা বন্দোবস্ত* বন্ধ করার ব্যাপারে দ্বিমত করলেন না ।

১৯৭৬ সাল । *আধিয়ারদের* মধ্যে যারা *একসনা বন্দোবস্তের* জন্য আসলেন তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে, বন্দোবস্ত নেয়ার দরকার নেই; জমিগুলো আবাদ করে যান । বিষয়টি আধিয়ার কৃষকদের মধ্যে জানা জানি হয়ে গেল । *আধিয়াররা* আবার ১৯৭৭ সালে খোঁজ নিলেন । এবারেও একই কথা বলা হলো ।

১৯৭৭ সাল । *একসনা বন্দোবস্ত* বন্ধ করে দেয়ার কাজটি হলো। তার পরের পদক্ষেপ নিয়ে *তহসিলদার* নোমান, মারফত প্রধান, সলিমউদ্দীন এবং তমিজউদ্দীনের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো । তহসিলদার নোমান যে কোন উপায়ে জমিগুলোর মালিক হওয়ার পরামর্শ দিলেন। আর এজন্য রীতিমতো জমি কিনে নেয়া হয়েছে— এমন প্রমাণের ব্যবস্থা করতে হবে, বললেন *তহসিলদার* নোমান। মারফত প্রধানের প্রশ্ন — এটা কিভাবে সম্ভব? একটা রাস্তা বের করতে হবে; বিষয়টা কঠিন তবে সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করে যেতে হবে; *তহসিলদার* নোমান আপাতত এভাবেই জবাবটা দিলেন ।

মারফত প্রধান এ বিষয়টা নিয়ে খুব সাবধানে সারাফত মন্ডলের সংগে আলাপ করলেন (দেখুন, পরিশিষ্ট-৩)। পুরোনো দিনের আলাপও হলো । তারা দু'জনে সিদ্ধান্ত নিলেন এ ব্যাপারে কাদের বিশ্বাসকে সংগে রাখতে হবে । কাদের বিশ্বাসের রাজনৈতিক পরিচিতি আলাদা হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই তারা একমত হতে পেরেছেন— এমন নজির ছিলো । তাই কাদের বিশ্বাসকে সংগে নেয়ার ব্যাপারটা চূড়ান্ত হলো ।

কাদের বিশ্বাসের সংগে একদিন আলোচনা হলো মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডলের । কাদের বিশ্বাস তার লাভ থাকলে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না- এমন ইঙ্গিত দিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সালের শেষের দিকে *তহসিলদার* নোমান, মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল, তমিজউদ্দিন এবং সলিমউদ্দীন মিলে আর একটা মিটিং এ বসলেন । এই মিটিং-এ তহসিলদার নোমান চার মৌজার জমিগুলোর মালিক হবার জন্য যে দলিলের দরকার হবে— সে বিষয়ে একটা পথের কথা বললেন ।

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে ফুলবাড়ি থানা । ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী ওখানকার অনেক ঘর-বাড়ি এবং অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় । ফুলবাড়ি থানা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসটাও পুড়ে ছাঁই হয়ে যায় । ১৯৭০ সালে ঐ সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে চার মৌজার জমিগুলোকে সৈয়দ নূরুল হুদা এবং অন্যান্য মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেয়া হয় । এবং দলিলগুলো সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে থাকা অবস্থায় পাক-হানাদার বাহিনীর দেয়া আগুনে পুড়ে যায়। এই গল্পের যুক্তিতে জমিগুলোর মালিক হবার পরামর্শ দিলেন *তহসিলদার* নোমান ।

কিন্তু দলিল পুড়ে গেলেও তো দলিল করা সাপেক্ষে একটা রসিদ থাকবে- এ প্রশ্ন অন্য সবার । *তহসিলদার* নোমান রসিদ বানিয়ে দেয়া সহজ বলে জানালেন । এবং আরো জানালেন ঐ রসিদের ভিত্তিতে তার অফিস থেকে খাজনা নেয়া এবং মিউটেশন করার কাজগুলোও তার দ্বারা সম্ভব। সিদ্ধান্ত হলো মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল এবং কাদের বিশ্বাস (দেখুন, পরিশিষ্ট-৩) কোন জমি নেবেন না । কারণ তাদের রাজনৈতিক পরিচয়টা একটা মর্যাদা বহণ করে । তবে তাঁরা পুলিশ, আদালত বা অন্যান্য সহযোগিতা - যা মধ্যস্বত্ব কায়েমের জন্য দরকার হবে তার ব্যবস্থা করবেন ।

আরো সিদ্ধান্ত হলো তহসিলদার নোমান তার কাজের জন্য ২৫ বিঘা জমি পাবে । আর সলিমউদ্দীন, তমিজউদ্দীন, আসর আলীসহ অনেককেই জমির মালিকানার কাগজ-পত্র তৈরী করে দিবেন তহসিলদার নোমান । সলিমউদ্দীন এবং সারাফত মন্ডল ঠিক করবেন কারা জমির মালিক হবেন এবং কাকে কতটা জমির কাগজ-পত্র দেয়া হবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হলো । জমির মালিক বানানো হলো ৪৬ জনকে। এই ৪৬ জনের মধ্যে সলিমউদ্দীন এবং আরো দু'জন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোক । অন্যান্যরা মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । কয়েকজন আবার নিম্নবিত্ত। এর মধ্যে বড় অংশটি ১৯৭২-৭৫ সালের মধ্যস্বত্বভোগী লোকজন। এর জন্য টাকাও খরচ হলো । টাকার কিছু অংশ নিল ভূমি অফিস এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের 'কাগজ ঠিক করে দেয়া লোকজন'। আর কিছু অংশ নিলেন মারফত প্রধান , সারাফত মন্ডল এবং কাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৮ সালের জুন মাস । একটা বড় আলোচনায় মিলিত হলেন মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল, কাদের বিশ্বাস এবং চার মৌজার জমিগুলোর সাজানো মালিকদের অন্যতম কয়েকজন । মিটিংটা হলো সলিমউদ্দীনের এক আত্মীয়ের বাড়িতে । সলিমউদ্দীনের ঐ আত্মীয়ের বাড়ি পার্শ্ববর্তী থানা পীরগঞ্জে । রাণীশংকৈলে মিটিং করলে বিষয়গুলো জানা-জানি হয়ে যেতে পারে — এই হিসেব থেকেই স্থান নির্বাচন করা হলো ৮ মাইল দূরে পীরগঞ্জে। তহসিলদার নোমান তার দায়িত্ব আপাতত শেষ হওয়ার কথা জানালেন ।

৪.৩.৩ মধ্যস্বত্ব কায়েমের চূড়ান্ত পরিকল্পনা

কাগজ-পত্র সবার হাতে এসেছে । এখন কিভাবে জমিগুলোর দখল নিশ্চিত করা যায় সেটাই আলোচনার বিষয়। জমির দখল নিতে হলে কি করা দরকার- এ নিয়ে আলোচনা চললো । নোমান *তহসিলদার* উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন, ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না । কারণ ১৯৭৫ সালে *আধিয়ার* কৃষকদের একসনা বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিলো। ঐ বন্দোবস্ত দেয়ার ঘটনাটাই সমস্যার সৃষ্টি করবে । *আধিয়ার* কৃষকরা এটা বোঝেন যে, একসনা বন্দোবস্ত শুধুমাত্র সরকারী কোন জমির ক্ষেত্রেই হতে পারে । তাই ১৯৭০ সালের মালিকানার কাগজ-পত্রকে তারা বিশ্বাস করবেন না । আর দখল নিতে গেলে প্রতিরোধ করবেন- এটাই স্বাভাবিক । সলিমউদ্দীন বললেন, চার মৌজার আধিয়ার কৃষকদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই । আর গ্রামগুলো একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন । তাই প্রতিরোধ বড় ধরনের হবে না । তিনি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরলেন । ঐ সময় কোন প্রতিরোধ হয়নি । আর চার *মৌজার* আধিয়ার কৃষকদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগও হয়নি । সারাফত মন্ডল বললেন, সময় পাল্টেছে । আর লোকজন অনেকটা সচেতনও হয়েছে। জমি দখল করতে গেলে *আধিয়ার* কৃষকদের প্রতিবেশী ছোট-বড় কৃষকরাও বিষয়টা ভাল চোখে দেখবে না । মারফত প্রধান এবং কাদের বিশ্বাস দুজনই ধীরস্থির প্রকৃতির লোক। তাঁরা সব কথা শোনার পর সিদ্ধান্ত দিলেন । সিদ্ধান্ত হলো পুলিশকে যেভাবেই হোক পক্ষে রাখতে হবে । আর পুলিশকে পক্ষে রাখার জন্য কিছু অর্থ-কড়ির যোগাড় থাকলেই হবে । আরো সিদ্ধান্ত হলো যে, আসর আলী (দেখুন, পরিশিষ্ট-২) জমি দখলের প্রথম চেষ্টা করবে উত্তর গাঁয়ে । আসর আলী ৪৫ বিঘা জমি আধিয়ার কৃষকদের ছেড়ে দিতে বলবেন । তারা ছাড়তে চাইবেনা হয়তো । তারপর ফসলের ভাগ দাবী করবেন আসর আলী । তারা হয়তো তাও দিতে চাইবে না । তাই পুলিশের সংগে আগেই কথা বলে রাখতে হবে । পুলিশ পক্ষে থাকবে। পুলিশ আসর আলীর মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে । তাহলে আর সমস্যা থাকবে না । উত্তরগাঁও-এর

Dhaka University Institutional Repository

জমি দখল কিংবা ফসলের ভাগ নিশ্চিত করার পরই বলিদ্বারা এবং অন্য মৌজাগুলোতে একই কৌশলে জমির মালিকানা এবং দখল প্রতিষ্ঠা করা হবে ।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে । বিষয়টি হলো: যখন জমির কাগজ-পত্র বানানো হয় তখন একটা হিসেব করা হয়েছিলো যে কিছু সাহসী অথচ অনুগত এমন লোকের নামেও কিছু জমির কাগজ-পত্র বানানো দরকার । এবং সেভাবে কাজও করা হয়েছিলো । অথচ যাদের নামে কাগজ-পত্র হলো তারা প্রথম দিকে কিছুই জানতেন না । তবে এমন লোকের সংখ্যা ৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন । প্রত্যেকের নামে ২ বিঘা করে জমির কাগজ-পত্র তৈরী করা হয় । এবং এদের সাহসের মাপকাঠি ছিলো অন্যের জমি দখল করে দেয়ার ক্ষেত্রে লাঠিয়াল হিসেবে পরিচিতি এবং পুলিশের ডায়েরীতে ডাকাতি মামলার আসামী। বস্তুত ঐ লোকগুলোর মধ্যে কয়েকজন রাণীশংকৈলের সাধারণ মানুষের কাছে দুর্ধর্ষ লোক হিসেবে পরিচিত ।

আষাঢ় মাস । উত্তর গাঁয়ের আধিয়ার কৃষকদের হাল নেমেছে মাঠে । বীজতলায় ঘন সবুজ চারা গাছগুলো অপেক্ষমান । *রোপা আমন* লাগানোর প্রস্তুতি চলছে। কাদা-পানিতে হাল চাষের কাজে দুপুর পার হয়ে যায় মাঠে। আষাঢ়ের মেঘ-ঢাকা বিকেলে বাড়ি ফেরা হয় কৃষকের ।

এমনি এক মেঘ-ঢাকা বিকেল বেলা । রসুলপুরের আসর আলীর সংগে লেহেম্বা ইউনিয়নের মজি, ফজি এবং কবুল। চারজনই দাঁড়ালেন *আধিয়ার* জহর হোসেনের বাড়ির পাশ ঘেসে যাওয়া রাস্তায় । ডাকলেন জহর হোসেন, সবুর আলী এবং এশা মন্ডলকে (দেখুন, পরিশিষ্ট-৫)। তিনজনই উত্তর গাঁয়ের *আধিয়ার* কৃষক। উত্তর গাঁয়ের অন্যান্য *আধিয়াররা* এই তিনজনকে বিচার-সালিশ ক্ষেত্রে বেশ মান্য করেন। আসর আলী তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের। কিন্তু অন্য তিনজন পার্শ্ববর্তী গ্রাম অথচ অন্য ইউনিয়নের লোক। এ বিষয়টি আধিয়ার কৃষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । ঐ লোকগুলো নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত সামাজিক অবস্থানের । কিন্তু রাণীশংকৈলের অন্তত তিনটা ইউনিয়নের লোকজন তাদেরকে চেনেন । এই তিনজনের মধ্যে ফজি এতো বেশি পরিচিত যে, 'ফজি ডাকাত' বললেই সবাই চিনবেন । যাহোক, তারা আধিয়ার কৃষক জহর হোসেন এবং অন্যান্যদের জানালেন যে, উত্তরগাঁয়ের যে জমিগুলো তারা চাষ করছেন সেগুলো তারা (আসর আলীরা) কিনে নিয়েছেন । চাষ করলে ফসলের ভাগ দিতে হবে- এ কথা মনে রাখার কথা বললেন। সংগে সংগে চিৎকার দিয়ে ওঠলেন জহর হোসেন এবং উপস্থিত আধিয়ার কৃষকরা । ক্ষোভে রাগে তাদের শরীর কাঁপছে। এমন অবস্থা দেখে আসর আলী আর কোন কথা না বলে তার সংগের তিনজনসহ চলে গেলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৪ পুলিশি নিপীড়নের সূচনা ও মধ্যস্বত্বের মূল নেতৃত্ব

তারপর দিনই চারজন পুলিশ এসে খোঁজ করলেন জহর হোসেন, এশা মন্ডল এবং আরো কয়েকজন *আধিয়ার* কৃষককে । পেয়েও গেলেন। অতঃপর রশি দিয়ে বাধলেন পাঁচজনকে । এই পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন, জহর হোসেন, সবুর আলী, এশা মন্ডল এবং কলিম ও হালিম । অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে করতে পুলিশ স্টেশন অভিমুখে তাদেরকে নিয়ে চললেন পুলিশ চারজন । পুলিশ স্টেশন উত্তরগাঁও গ্রাম থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে । আসর আলীর জমি তারা আধি করছেন - এই মর্মে একটা লিখিত দিলে ছেড়ে দেয়া হবে, এই কথাগুলো পুলিশ চারজন বার বার বললেন । আর তা না করলে ডাকাতি মামলা দিয়ে জেল-হাজতে পাঠানো হবে এ হুমকিও তারা দিলেন। এসব হুমকিতে ভয় পেয়ে কলিম এবং হালিম কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেয়। তারা লিখিত দিলো। তাদের কাছে একটা কাগজে সই নেয়া হলো। আগেই কিছু একটা লেখা ছিলো ঐ কাগজে। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো । সবুর আলী বয়স্ক লোক। হাটতে হাটতে হাপিয়ে যাচ্ছিলেন- তাই তাকেও ছেড়ে দেয়া হলো । অবশ্য সবুর আলী লিখিত দেননি । জহর আলী এবং এশা মন্ডল জানিয়ে দেন, যত অত্যাচারই করা হোক না কেন তারা আসর আলীর জমি আধি করছেন এমন মিথ্যা কথা লিখবেন না। পুলিশ চারজন গালি-গালাজের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো । কিন্তু জহর আলী এবং এশা মন্ডল সিদ্ধান্ত পাল্টালেন না । শেষ পর্যন্ত পুলিশ স্টেশনের কাছাকাছি এনে তাদেরকেও ছেড়ে দেয়া হলো । তারা ফিরে আসলেন উত্তর গাঁয়ে। এমন একটা ঘটনা আধিয়ার কৃষকরা চিন্তাও করতে পারেনি । তারা এখন কি করবেন- এ নিয়ে সবাই আলোচনা করলেন । সিদ্ধান্ত হলো এসব ঘটনা প্রাক্তণ এম.পি মারফত প্রধানকে জানানোর। মারফত প্রধান তার সমর্থক লোকজনকে ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত মধ্যস্বত্ব আদায়ে যদিও সমর্থন করেছিলেন কিন্তু বর্তমানে হয়তো সমর্থন করবেন না । তিনি যদি কৃষকদের পক্ষে থাকেন তাহলে কোন সমস্যা হবে না । এসব আলোচনার পর জহর হোসেন, এশা মন্ডল, সবুর আলী— এই তিনজন মারফত প্রধানের সাথে দেখা করলেন রাণীশংকৈল বাজারে । মারফত প্রধানের কাছে তারা সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন। মারফত প্রধান এমন ভান করলেন- যেন তিনি কিছুই জানেন না । শেষে মারফত প্রধান বললেন, আসর আলী এবং অন্য যারা জমি দাবী করছেন তাদের নিশ্চয় দলিল-পত্র আছে। আর *আধিয়ার* কৃষকদের তো কোন দলিল-পত্র নেই । তাই আসর আলী এবং অন্য যাদের কথা বলা হলো তাদেরকে জমির মালিক মেনে নিতে আপত্তি কোথায়? এ রকম একটা মতামত *আধিয়ার* কৃষকরা আশা করেননি। তারা প্রায় তিন দশক ধরে জমিগুলো আবাদ করে আসছেন । জমিগুলোর মালিককে তারা নিয়মিত ফসল দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর তাদের কাছ থেকে ক্ষমতার বলে ফসল আদায় করা হয় । এবং ১৯৭৫ সালে তারা

Dhaka University Institutional Repository

একসনা বন্দোবস্ত নিয়ে আবাদ করলেন । এ বিষয়গুলো তারা আর তুললেন না । চলে আসলেন উত্তর গাঁয়ে। অপেক্ষমান আধিয়াররা আলোচনার ফলাফল জানতে চাইলেন । জহর হোসেন সংক্ষেপে ফলাফল বললেন । সবাই শুনলেন ।

ডাকাত কি ডাকাতির বিচার করতে পারে? আষাঢ়ের মেঘের গর্জনের মতই বাক্যটা উচ্চারিত হলো, সবাই তাকালেন । ওমর আলী শরীরের সমস্ত শক্তি কণ্ঠে এনে হাঁক মেরে ঐ নিষ্ঠুর সত্য বাক্যটা উচ্চারণ করেছেন । ওমর আলী ষাটোর্ধ বৃদ্ধ । যমুনার পাড়ে ভাংগা-গড়ার জীবন সংগ্রাম আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাস তার ঐ চিৎকার । ওমর আলী যমুনার করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হয়ে ১৯৬০ সালে উত্তর গাঁয়ে আসেন । আধিয়ার কৃষক হিসাবে জীবন সংগ্রাম শুরু করেন । ছেলে মেয়েদের কিছুটা লেখা-পড়া শিখিয়েছেন। ছেলে আমির হোসেন এখন সংসারের হাল ধরেছে । ওমর আলী জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন— সাধারণ দৃষ্টিতে এমনই মনে হতো । কিন্তু আবার যেন ভাংগনের আওয়াজ ! তাই ওমর আলীর কণ্ঠে এই বাজ্র-উচ্চারন। ওমর আলী যেন ভাংগন ঠেকানোর প্রস্তুতির সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন।

এরই মাঝে *আধিয়ার* কৃষকরা আমন ধান লাগালেন । ধানের ক্ষেত সোনালী হয়ে ওঠেছে । আধিয়ার কৃষকদের মুখে হাসি,বুকে আশা । *আধিয়ার* গৃহিণীরা নবান্নের অপেক্ষায় । ধান কাটা শুরু করার অপেক্ষায় কৃষক ।

৪.৩.৫ মধ্যস্বত্ব পুনরুত্থানের চূড়ান্ত পর্ব

১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাস । থানা থেকে পাঁচজন পুলিশ আসলেন উত্তর গাঁয়ে । জহর হোসেন, সবুর আলী, এশা মন্ডল এবং অন্যান্য *আধিয়ারদের* সংগে তারা কথা বলতে এসেছেন জানালেন। ধান কাটা কিভাবে হবে— সে সম্পর্কে তারা সিদ্ধান্ত দিতে এসেছেন বলেও জানালেন । *আধিয়ার* কৃষকদের কাছে বিষয়টা বর্গী হামলার মতো মনে হলো ।

পুলিশ পাঁচজন *আধিয়ারদেরকে* জমি থেকে অর্ধেক ধান কাটতে বললেন । আর অবশিষ্ট অর্ধেক ধান আসর আলীরা নিজ দায়িত্বে কেটে নিয়ে যাবেন— এমন কথা বললেন। আর *আধিয়াররা* যদি সমস্ত ধান কাটেন তাহলে অর্ধেক ফসল যেন থানায় অর্থাৎ পুলিশ স্টেশনে দিয়ে আসেন সে কথাটাও গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন । আধিয়ার কৃষকরা কিছু কথা বলতে চাইলেন । কিন্তু তাদেরকে কোন কথা বলার সুযোগ দেয়া হলো না ।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ পাঁচজন চলে গেলেন । *আধিয়ার* কৃষকদের মুখের হাসি আর ফসল ওঠার পর নানান পরিকল্পনা যেন নিমিষে উড়ে গেল। দিন-রাত শুধু ফসলের চিন্তা । নিজের লাগানো ফসল কাটা হবে কি-না —এই উৎকণ্ঠা ।

ধান কাটা শুরু হলো । *আধিয়ার* কৃষকরা কিছু কিছু ধান কেটে নিয়ে এসেছেন ঘরে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকাল বেলা আসর আলী, মজি, ফজি এবং কবুল সহ প্রায় ৭০/৮০ জন লোক ধেয়ে আসলেন উত্তর গাঁয়ের ফসলের মাঠে । তাদের অনেকের হাতে লাঠি, বর্শা, হাসুয়া । আর কাস্তে হাতে পেছনের লোকগুলো । মাঠে নামলেন। *আধিয়ার* কৃষকদের লাগানো ধান কাটা আরম্ভ করলেন । *আধিয়ার* কৃষক এবং কিষাণীরা জড়ো হলেন । যার যা আছে তা নিয়ে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় পেছন ফেরে দেখেন একদল পুলিশ । পুলিশের লোকজন লাঠিসোটা ফেলে দিতে বললেন *আধিয়ার* কৃষক-কিষাণীদের । মাঠের দিকে আগালে গ্রেফতার করে জেল-হাজতে পাঠানো হবে, এ হুমকি দিলেন পুলিশ। কিন্তু আসর আলীদের লাঠি সোটা ফেলতে বললেন না । প্রায় ২৫ বিঘা জমির ধান তারা কেটে নিয়ে গেলেন । পুলিশের দল ধান নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত উত্তর গাঁয়ে অপেক্ষা করলেন।

আধিয়ার কৃষকরা নিরূপায় । কার কাছে যাবেন তারা । ভেবে পান না । রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে তাদের মনে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন । কিন্তু কিভাবে কী করবেন ?

কিছু দিন পর আসর আলী, মজি, ফজি এবং কবুলের দল ২০/২৫ টা হাল দিয়ে প্রায় ৩০ বিঘা জমিতে চাষ দিলেন । সেদিনও পুলিশের লোকজন উত্তর গাঁয়ে । সময়টা ছিলো ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাস । *আধিয়ার* কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন । কিন্তু পেছনে পুলিশ । *আধিয়ার* কৃষাণীরা পুলিশকে গালি-মন্দ দিলেন কিন্তু পুলিশের রুক্ষ গলায় উচ্চারিত গালির ধরন এতো নগ্ন ছিলো যে *আধিয়ার* কিষাণীদের চুপ হয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে হলো।

বড় কৃষক নন্দন, মাঝারী কৃষক জয়নাল, ছোট কৃষক রফিকুল, দিনমজুর হাতেম আলী এবং উত্তর গাঁয়ের অনেকেই *আধিয়ার* কৃষকদের উপর অমানবিক নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেন । তারা আধিয়ার কৃষকদের মতোই আসর আলী এবং অন্যান্য ভুয়া জমির মালিক ও পুলিশের আচরণে ক্ষুব্ধ । নন্দন একদিন হোসেনগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুবলকে এ সব বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বললেন । নন্দন ও সুবল চেয়ারম্যান উভয়েই উচ্চবিত্ত সামাজিক অবস্থানের লোক । নির্বাচনের সময় নন্দনের বাড়িতে সুবলের যাওয়া-আসা বেড়ে যায় । নন্দন স্বাধীনতার পর থেকেই চেয়ারম্যান সুবলের পক্ষে । নন্দনের অভিযোগ শোনার পর সুবল চেয়ারম্যান বললেন, আধিয়ারদের অনেকেই তার কাছে এসেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সব কিছু তিনি জানেন । *আধিয়ার* কৃষকরা শুধু আসর আলী, ফজি, মজি, কবুল এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন । তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে, এসব ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে । তিনি আরো বললেন, তার ইউনিয়নের বলিদ্বারা এবং কলিগাঁও গ্রামেও উত্তর গাঁয়ের মতো ঘটনা ঘটছে । উত্তর গায়ের আধিয়ারদের সংগে অবশ্য ঐ গ্রামগুলোর যোগাযোগ নাই ।

সুবল তার নিজের অবস্থা সম্পর্কেও নন্দনকে বললেন । বললেন তার অসহায় অবস্থার কথা । বললেন জেনে-শুনেও চুপ করে থাকতে হচ্ছে । রাণীশংকৈলের সবাই জানেন সুবল চেয়ারম্যান মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডলের কথামতো চলেন । কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়- এমন কথাও সুবল চেয়ারম্যান বললেন নন্দনকে ।

মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল, সলিমউদ্দীন ও তমিজ উদ্দীনদের পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র উত্তর গাঁয়ে সফলতা আসলো । মধ্যস্বত্বের পুনরুখান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো উত্তর গাঁয়ে ।

উত্তর গাঁয়ের পরিকল্পনা সফল হওয়ার প্রায় সংগে সংগে মারফত প্রধানরা বলিদ্বারা, কলিগাঁও এবং বাকসা সুন্দরপুর গ্রামে মধ্যস্বত্ব কায়েমের সিদ্ধান্ত নেন ।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ । আমন ধান-কাটা শেষ হয়েছে । বলিদ্বারা, কলিগাঁও এবং বাকসা সুন্দরপুরের *আধিয়ার* কৃষকরা ধান কেটে ঘরে এনেছেন । কিছু ধান মাড়াই হয়েছে; কিছু হয়নি । ধান সিদ্ধ হচ্ছে, চাল বানানো হচ্ছে । পৌষের কনকনে শীতে পিঠার আয়োজনও আধিয়ার কৃষকদের ঘরে ঘরে ।

সলিমউদ্দীন, তমিজউদ্দনি এবং গোলাম হোসেন বলিদ্বারা গ্রামের আধিয়ার নফের-এর বাড়িতে আসলেন । তিনজনকেই বসার কথা বললেন নফের । তিনজনের মধ্যে সলিমউদ্দীন এবং তমিজউদ্দীন শিক্ষিত লোক । অবশ্য এই দু'জন ১৯৭২-৭৫ সালে বলিদ্বারার আধিয়ার কৃষকের কাছ থেকে দলের লোকজনের পেছনে খরচের নাম করে কিছু কিছু ধান বা ধানের বদলে টাকা নিতেন। নফের ঐ পুরোনো দিনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। সলিমউদ্দীন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বড় কৃষক । একটা দলের নেতা পর্যায়ের লোক। তমিজউদ্দীন মধ্যবিত্ত কৃষক; বি.এ. পাশ । সলিমউদ্দীনের মতো ঐ দলেই তার অবস্থান (দেখুন, পরিশিষ্ট-২)। আর গোলাম হোসেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যায়ের লোক। প্রাইমারী স্কুলের লেখাপড়া শেষ করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

নফের-এর বাড়িতে বসে তারা দবিরউদ্দীন, নলিয়া এবং মুহাম্মদেরও খোঁজ নিলেন । নফেরের বাড়ির পাশেই দবিরউদ্দীন-নলিয়াদের বাড়ি । নফের তার ছেলে তফিরকে পাঠালেন তাদেরকে ডাকতে। নফেরের মনে হলো সামনে সাধারণ নির্বাচন, হয়তো সে বিষয়ে কিছু কথা হবে । দবিরউদ্দীন এবং নলিয়াও আসলেন । মুহাম্মদ বলিদ্বারা বাজারে গেছেন জানালো তফির । সলিমউদ্দীন আসল কথায় চলে আসলেন । বললেন, বলিদ্বারায় নুরুল হুদার জমিগুলোর মালিকতো শুধু নুরুল হুদা ছিলেন না । অনেক মালিক ছিলেন। জমিগুলোর প্রায় তিনভাগ তাদের কেনা হয়ে গেছে । টাকা থাকলে বাকীটাও নেয়া যেতো । কিন্তু যুদ্ধের কারণে লোকগুলো চলে গেলেন । আর কেনা হলো না । নফের এবং দবিরউদ্দীন প্রায় এক সংগে প্রশ্ন করলেন, কোন জমি? যেগুলো তোমরা আবাদ করছো— উত্তর। এবার তমিজউদ্দীন সোজাসুজি বললেন, এতোদিন তারা ফসলের ভাগ নিতে আসেননি । এখন থেকে ফসলের ভাগ নেয়া হবে । এবং এ জন্যই তারা এসেছেন। নফের, দবিরউদ্দীন এবং নলিয়াকে অর্ধেক ধান হিসেব করে রাখার কথা বলা হলো । সাঁওতাল পাড়া সহ অন্যান্য আধিয়ারদের এ খবর দেয়ার একরকম নির্দেশও দেয়া হলো। তারা তিন/চারদিন পর আসবেন বলে গেলেন। এ ঘটনা দ্রুত বলিদ্বারার আধিয়ার কৃষকদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলো । *'জান দেবেন তবু ধান দেবেন না'* — এমন আলোচনাও তারা করলেন । তীর ছুড়বেন ধান নিতে আসলে - বসাক টুডু একথা চিৎকার দিয়েই বললেন । বসাক টুডু আদিবাসী সাঁওতাল । পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকেই বলিদ্বারার জমি আধি করছেন।

তিন দিন পর তারা আসলেন, সংগে ৪ জন পুলিশ । পুলিশের উপস্থিতিতে সলিমউদ্দীন-তমিজউদ্দীনেরা সবার বাড়ি বাড়ি যেয়ে ধান বের করলেন । গরু গাড়ীতে করে ধান নিয়ে যাওয়া হলো। কয়েক দিন পর বেশ কিছু হাল দিয়ে আধিয়ারদের জমিতে চাষ দেয়া হলো । হাল চাষ দেয়ার সময়ও পুলিশ উপস্থিত ছিলো । জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা কোথায় যাবে, কি করবে- এ চিন্তায় আধিয়ার কৃষকরা সন্ত্রস্ত । প্রতিবাদের আগুন তাদের বুকে কিন্তু প্রতিবাদী হতে পারছেন না । শেষ পর্যন্ত নিরুপায় আধিয়াররা রাগে-ক্ষোভে সলিমউদ্দীনদেরকেই জমির মালিক মেনে নিয়ে জমি আবাদের সুযোগ চাইলেন। আধিয়ারদের অনুরোধও তারা রাখলেন । তবে যার তিন বিঘা জমি আবাদে ছিলো তার দেড় বিঘা নিয়ে নেয়া হলো। দেড় বিঘা জমি আধি শর্তে আবাদ করতে দেয়া হলো । অর্থাৎ আধিয়ারদের আবাদের জমিগুলোর অর্ধেক কেড়ে নিয়ে নিজ দায়িত্বে আবাদ করেন মধ্যস্বত্বভোগীরা। আর অবশিষ্ট অর্ধেক জমি কেড়ে নিয়ে আবার বর্গা স্বত্বে আধিয়ারদেরকে আবাদ করতে দেয়া হয়।

কলিগাঁও গ্রামেও পুলিশের সহায়তায় একই ঘটনা ঘটানো হলো । এখানেও আধিয়ার কৃষকদের কাছ থেকে জমির প্রায় পঞ্চাশ ভাগ কেড়ে নেয়া হলো। আর যেগুলো আধিয়ার কৃষকরা আবাদ করবেন

Dhaka University Institutional Repository

তার আধিভাগ দিতে হবে-এই শর্ত জুড়ে দেয়া হলো । উত্তরগাঁও গ্রামেতো প্রথমেই হয়েছে । কলিগাঁও-এর আধিয়ার কৃষকদের বাড়ি থেকে পুলিশের উপস্থিতিতে ধান বের করলেন চেলা হোসেন, নজরুল এবং তাদের সংগের কয়েকজন (দেখুন, পরিশিষ্ট-১,২)। বাকসা সুন্দরপুর গ্রামে সাগরেদ আলী, মফিজ এবং হাবুল আধিয়ার কৃষকদের বাড়ি থেকে ধান নিয়ে আসলেন, জমিতে চাষ দিলেন । আধিয়াররা ক্ষুব্ধ । পুলিশের একটা দল বাকসা সুন্দরপুরের ক্ষুব্দ আধিয়ারদেরকে ধমক দিয়ে ঠান্ডা করলেন। আউস ধান, যাকে রানীশংকৈলের কৃষকরা *ভাদুই ধান বলেন,* -তারও ভাগ দিতে বাধ্য হলেন আধিয়াররা ।

এইভাবে চার মৌজায় মধ্যস্বত্বের পুনরুত্থান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো । মধ্যস্বত্ব কায়েম হলো । আধিয়ার কৃষকদের বুকে আগুন জ্বলছে । তারা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায় । কিন্তু প্রতিবাদ মানেই পুলিশের সংগে লড়াই । নির্ঘাত জেল-হাজত, এমনকি গুলিবিদ্ধ হয়েও অনেকের জীবন প্রদীপ নিভে যেতে পারে । আধিয়ার কৃষকদের প্রচন্ড ক্ষোভ পুলিশের বিরুদ্ধে । ক্ষোভ রাণীশংকৈলের নেতা নামধারী কিছু লোকজনের উপর । থানা-পুলিশের দোসরদের উপরও ক্ষোভ আছে। যদিও দুঃস্বপ্ন আধিয়ার কৃষক-কিষানীদের আচ্ছন্ন করে ফেলে । কিন্তু দুঃস্বপ্নের মাঝেও তারা প্রতিবাদী হতে চান এবং বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেন ।

৪.৪ সাধারণ নির্বাচন ও আধিয়ার কৃষকদের নিরব প্রতিবাদ

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস । বাংলাদেশে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন । রাণীশংকৈল নির্বাচনী এলাকায় কয়েকজন প্রার্থী । তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে দু'জনের মধ্যে এমন ধারণা সবার । মারফত প্রধান একটি দলের প্রার্থী । ঐ দলের প্রার্থী হয়ে তিনি ১৯৭৩ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এতো বেশি ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছিলেন যে, কাউকে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবাটাই লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো । আর একজন প্রার্থী মির্জা । মির্জার বাড়ি ঠাকুরগাঁও শহরে । পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন । বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চুপচাপ ছিলেন । ১৯৭৫ এর পর আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন । তবে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে নয়, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে । মির্জা সাহেব স্থানীয় লোক না হলেও তার পরিচিতি এই এলাকায় নতুন নয় । এ দু'জন বাদে বামপন্থী দুটি দলের আরো দু'জন প্রার্থীও আছেন । কিন্তু তারা লোকজনের খুব একটা পরিচিত না ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনী প্রচারণায় স্থানীয় এবং বহিরাগত প্রার্থীর বিষয়টা খুব বেশী প্রাধান্য পেলো । মারফত প্রধান স্থানীয় মানুষ । সুখে-দুঃখে সব সময় কাছে পাওয়া যাবে- এ যুক্তিটা মিটিং কিংবা নির্বাচনী মিছিলে মারফত প্রধানের লোকজনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ালো । মির্জা সাহেবের মিছিল এবং মিটিংগুলোতে প্রাধান্য পেলো আলাদা যুক্তি । লোক যেখানকারই হউক, মির্জা সাহেব ভাল লোক । এই যুক্তিটা মির্জা সাহেবের লোকদের। যুক্তিটা অবশ্য প্রচারণার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারছিলো না। তাই নির্বাচনী হাওয়া মারফত প্রধানের পক্ষেই মনে হচ্ছিল ।

চার গ্রামের *আধিয়ার* কৃষকদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিলো না । কিন্তু চার গ্রামের সবাই মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডলের ভূমিকা এবং অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পেয়ে যান । এই ধারণা থেকে স্বতন্ত্রভাবেই চার গ্রামের *আধিয়ার* কৃষকরা মারফত প্রধানকে ভোট না দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত খুব গোপনে নেয়া হয়। তাই নির্বাচনের দিনে কিংবা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরও তারা কোন পক্ষের— তা বোঝা কঠিন ছিলো ।

আধিয়ার কৃষকদের অনেক প্রতিবেশীও এ সিদ্ধান্তের সংগে একমত হন । প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই বড় কৃষক। মাঝারী কৃষক, ছোট কৃষক এবং দিনমজুরও আছে অনেক। মারফত প্রধানের নির্বাচনী প্রচারণার মূল লোকজনই ছিলেন পুলিশসহ আধিয়ার কৃষকদের বাড়িতে আসা লোকজন । তারা যখন স্থানীয় প্রার্থী, ভালো প্রার্থী — এই যুক্তিতে আধিয়ার কৃষকদের মন জয় করার চেষ্টা করছিলেন- তখন আধিয়াররা শুধু চুপ করে শুনতেন । আর মনে মনে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করতেন ।

মির্জা সাহেবের লোকজন ভোটের জন্য আসলেন। আধিয়ার কৃষকরা তাদের কাছে কাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মৃদু অভিযোগ পেশ করেন । অভিযোগটা ছিলো মারফত প্রধানদের সংগে কাদের বিশ্বাসের হাত মেলানোর বিষয়। মির্জা সাহেবের লোকজন হতাশ হয়েই ফিরে যান । কারণ মির্জা সাহেবের দলের একজন বড়ো নেতা কাদের বিশ্বাস।

নির্বাচনের দিন আধিয়ার কৃষক-কিষাণীরা ভোট কেন্দ্রে গেলেন, ভোট দিলেন । ভোটের সময় বেশির ভাগ ভোটার চা, পান ইত্যাদি আশা করেন । কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অর্থও । আধিয়ার কৃষক-কিষাণীরা সচেতনভাবেই এগুলো পরিহার করেন । কিন্তু ভোট দেয়া থেকে তাদের মধ্যকার কেউ যেন বাদ না পড়ে সে দিকটার প্রতি বেশ নজর দেন ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হলো ।মারফত প্রধান অনেক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলেন । কে বিজয়ী হলেন- এটা *আধিয়ার* কৃষকদের কাছে বড়ো বিষয় ছিলো না। বড় বিষয় ছিলো মারফত প্রধানের পরাজয়টা । মারফত প্রধানের পরাজয় ঘটাতে আধিয়ার কৃষকদের ভোটের ভূমিকা হয়তো সামান্যই ছিলো। কিন্তু এই পরাজয়ে তাদের দেহ-মনে নির্বাক উল্লাসের ঝর্ণাধারা বয়ে গিয়েছিলো । মারফত প্রধানের পরাজয় যেন চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকদের বিজয়, তাদের নীরব প্রতিবাদের ফসল।

৪.৫ আন্দোলনের রাজনৈতিক মঞ্চ

১৯৭৯ সালে রাণীশংকৈলের বিভিন্ন ইউনিয়নে গরু চুরির ঘটনা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। ছোট, বড় এবং মাঝারী কৃষকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন । রাত পোহালেই কোন না কোন গ্রামে কান্নার রোল পড়ে যায়। মাটির দেয়ালে কপাল ঠুকে আহাজারি করেন কৃষক । হালের বলদ চুরি হওয়ার পর অনেক কৃষক পাগল প্রায় । ওদিকে পাটের বাজার মন্দা, আখের দামও কম । গুড় তৈরী করতে পারলে আখের আবাদ করে লাভ হয়, কিন্তু এতেও বাধা । কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে গেলে হাট-তোলা দিতে বাধ্য হয়। এমন একটা দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে দিন যায় রাণীশংকৈলের কৃষকদের । তারা বিক্ষুব্ধ অথচ বিক্ষোভ প্রদর্শনেও ব্যর্থ ।

এমনি একদিন বলিদ্বারা বাজার ।একটা চা দোকানের পাশে বসে আছেন দাহার মাষ্টার এবং তসিরউদ্দীন মেম্বার । তারা কৃষকদের অসহায় অবস্থা সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করছেন। দাহার মাষ্টার বিলাশপুর জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষক, সামাজিক অবস্থান নিম্ন মধ্যবিত্ত । আর তসিরউদ্দীন হোসেনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এবং একজন বড় কৃষক। ভালো মেম্বার হিসেবে লোকজনের কাছে তার বেশ পরিচিতি। সাম্প্রতিককালে তারা দুজনই একটা সংগঠনের সদস্য হয়েছেন। এই সংগঠনের সংগে বলিদ্বারা এলাকার আরো কয়েকজন জড়িত । তবে সর্ব-সাকূল্যে সদস্য কুড়ি জনের বেশি নয়। দু'জনই বাম রাজনীতির সংগে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন । কিন্তু স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক পরিচয় থেকে তারা প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলেন । আদর্শিক পরিচয়টা অবশ্য ছিলো। কিন্তু নিজের পরিবারের বাহিরে কেউ ঐ পরিচয়ে চিনতো না (দেখুন, পরিশিষ্ট-৪)।

বুধারাম এবং আনিস হোসেনও হাজির হলেন চা দোকানে । তারাও ঐ সংগঠনের সদস্য । এদের সবার বাড়ি বলিদ্বারা এলাকায় । বলিদ্বারা একটা বড়ো গ্রাম । একটা বড় বাজারও আছে এখানে।

Dhaka University Institutional Repository

বলিদ্বারা বাজারের মাঝ দিয়ে সীমান্তের থানা হরিপুরে যাবার আধা-পাকা রাস্তা। ধান চালের ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে রাণীশংকৈলের সবার কাছে বলিদ্বারা পরিচিত। রাণীশংকৈল সদর থেকে আড়াই মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম এবং বাজারের অবস্থান। সেখানকার নিম্ন মধ্যবিত্ত সামাজিক অবস্থানের শিক্ষিত যুবক ইশান চন্দ্র। বলিদ্বারা থেকে বেশ দূরে হরিপুর থানার একটা হাই স্কুলে জীব বিজ্ঞান পড়ান। বুধা রামের সামাজিক অবস্থান নিম্নবিত্ত, পেশা কৃষি। ধানের মৌসুমে হাট-বাজারে ধান কেনা-বেচাও করেন। আর আনিস হোসেন লেখাপড়া শেষ করে উচ্চবিত্ত বাবার কৃষি এবং রাইস মিলের ব্যবসা (হাসকিং মিল) দেখাশোনা করেন (দেখুন, পরিশিষ্ট-৪)।

পাঁচজনের মধ্যে আলোচনা চলছে। পাশের চা দোকান থেকে বারবার চা দেয়া হচ্ছে। ফাল্গুনের সূর্য্যের ডুবু ডুবু অবস্থা। দোকানে দোকানে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানোর প্রস্তুতি চলছে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে রাণীশংকৈলের হাটগুলো সন্ধ্যার পরও জম-জমাট থাকে। প্রখর রোদের ঝাঁঝালো দুপুর গড়িয়ে লোকজন হাটে (বাজারে) আসেন। বড় হাট। তাই এই হাটে চারিধারের আট-দশটা গ্রাম থেকে লোকজন আসে।

আলোচনার এক পর্যায়ে ইশান চন্দ্র কৃষকদের সমস্যা নিয়ে একটা মিছিল করার প্রস্তাব দিলেন। সংগে সংগে দাহার মাষ্টার এবং তসিরউদ্দীন মেম্বার রাজি হয়ে গেলেন। ঝট-পট দাঁড়িয়ে গেলেন পাঁচজনই। বুধা রামের কণ্ঠে জোরালোভাবে উচ্চারিত হলো শ্লোগান- কৃষক মুক্তি সমিতি, কৃষক মুক্তি সমিতি[২]। বাকী চারজনের কোরাস জবাব- জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। গরু চুরি বন্ধ কর, নইলে পুলিশ এলাকা ছাড়ো। শ্লোগান দিতে দিতে পাঁচ জনের ছোট্ট মিছিলটা ঢেঁকি-ছাঁটা চাল-হাটের সরু রাস্তা দিয়ে বাজারের ভেতরে ঢুকলো। গরু চুরির বিরুদ্ধে, হাট তোলার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে এগিয়ে চললো মিছিলটা। অবাক চোখে লোকজন তাকিয়ে আছেন। ইতোমধ্যে এই পাঁচজনের পেছনে আরো পাঁচ-ছয়জন হাজির হয়ে শ্লোগানের জবাব দিচ্ছেন। তারাও কৃষক মুক্তি সমিতির সদস্য। শ্লোগান শুনেই ছুটে এসে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। মিছিল যখন আরো একটু এগিয়ে তরি-তরকারী হাট এবং ধান হাটের মাঝামাঝি তখন, 'গরু চুরি বন্ধ কর' শ্লোগানের জবাবে শতকণ্ঠে উচ্চারিত হলো— 'নইলে পুলিশ এলাকা ছাড়ো'। দাহার মাষ্টার এবং মিছিলের অন্যান্যরা সবাই চমকে উঠলেন। এতো লোকের কণ্ঠ! তারা দেখলেন নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে গরু চুরি বন্ধের শ্লোগানের জবাব দিচ্ছে লোকজন। তারা শ্লোগানের জবাব দিচ্ছে মিছিলে সামিল না হয়েই। মিছিলের এমন একটা অবস্থা দাঁড়ালো যে, কৃষক মুক্তি সমিতি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ— এই শ্লোগানে কণ্ঠ মেলাচ্ছে মাত্র দশ-বারো জন। আর গরু চুরির শ্লোগানে শতকণ্ঠ।

Dhaka University Institutional Repository

মিছিলটা ঘুরে আসলো আগের সেই চা দোকানের পাশে ভলিবল খেলার মাঠে। শত শত লোক জড়ো হলো মিছিলকারীদের ঘিরে । তসিরউদ্দীন মেম্বার কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কয়েক মিনিট বক্তব্য রাখলেন। মানুষের ভীড় কমছেনা, তারা আরো শুনতে চান ।

বলিদ্বারা হাটের এই মিছিল কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি সৃষ্টির আকাঙ্খা আর বাস্তবতার সন্ধিক্ষণে কৃষক কর্মীদের গতি হয় দুর্বার। পর দিনই খবর দেয়া হলো রাণীশংকৈলের নয়ন মোল্লা এবং তজির হোসেনকে। বাচোরের কবিরুলকেও খবর দেয়া হলো। এই তিনজনই কৃষক মুক্তি সমিতির নিবেদিত কর্মী । বলিদ্বারায় ইশান চন্দ্রের বৈঠক ঘরে বসা হলো । আগের দিনের মিছিলের অভিজ্ঞতাটাই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। কৃষকরা বারুদের মতো অবস্থায়, জ্বলে ওঠতে তারা প্রস্তুত । দরকার এখন সংগঠন । এ কথাগুলো সবাই বললেন। গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ আর সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত হলো ।

৪.৫.১ কৃষক মুক্তি সমিতির গরু চুরি ইস্যু ও গণসংযোগ

সংগঠন গড়ে তোলার কাজে লেগে গেলেন কৃষক মুক্তি সমিতির ঐ ক'জন কর্মী । এক মাসের মধ্যে হোসেনগাঁও ইউনিয়নের প্রায় সবকটা গ্রামে এবং বাচোর ইউনিয়নের কয়েকটা গ্রামে তারা পৌঁছে গেলেন। তবে এ পর্যায়ে কেবল যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হলো। সর্বস্তরের কৃষকরা গরু চুরি বন্ধের আন্দোলনে প্রস্তুত। প্রস্তুত হাট তোলা বন্ধের প্রতিবাদ জানাতে।

গরু চুরি প্রতিরোধের জন্য গণসংযোগ করতে গিয়ে কৃষক কর্মীরা অন্য ধরনের একটা সমস্যার কথা জানতে পারেন । সমস্যাটা *আধিয়ার* কৃষকদের জমি এবং জীবনের সমস্যা । অবশ্য এই সমস্যা হোসেনগাঁও ইউনিয়নের তিনটি গ্রামের এবং বাচোর ইউনিয়নের একটা গ্রামের লোকজনের । *আধিয়ার* কৃষকরা এই সমস্যাটার কথা কৃষক কর্মীদের জানান। এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা চান।

গরু চুরির পাশাপাশি চার গ্রামের *আধিয়ার* কৃষকদের সমস্যাটা কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীদেরকে কিছুটা ভাবিয়ে তোলে। । বিষয়টা নিয়ে কিছু আলোচনাও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা স্থগিত রাখা হলো । কারণ গরু চুরি, হাট খাজনা, পাটের দাম, আখের দাম-এই ইস্যুগুলো তাদের কাছে এই মূহূর্তে মূখ্য। তাই গরু চুরির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়টাই প্রাধান্যে থাকলো, অন্য কিছু নয়।

Dhaka University Institutional Repository

চৈত্র মাসে রাণীশংকৈল কলেজ মাঠে একটা জনসভা করা হলো । গরু চুরির প্রতিবাদ করা হলো- এই জনসভা থেকে । কলেজ মাঠ সংলগ্ন বড় হাটের দিনে জনসভা হওয়ায় কৃষকরা সভাস্থলে ব্যাপক ভীড় করলো । গরু চুরি বন্ধ করার কথা, আন্দোলনের কথা বললেন দাহার মাষ্টার, নয়ন মোল্লা এবং কবিরুল ইসলাম (দেখুন, পরিশিষ্ট-৪) । লোকজনের বেশ সমর্থন পাওয়া গেলো।

১৯৭৯ সালের মে মাসে গরু চুরির প্রতিবাদে আর একটা জনসভা হলো। রাণীশংকৈল মডেল স্কুল মাঠে এই জনসভায় কৃষক মুক্তি সমিতির ঢাকা থেকে আসা দু'জন নেতাও বক্তব্য রাখেন । তারা আখের দাম, পাটের দাম এবং হাট তোলা ইত্যাদি প্রসংগে বক্তব্য রাখেন। কৃষক এবং সর্বস্তরের বেশ লোকজন সভায় হাজির হয়েছিলো।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে কৃষক মুক্তি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির দীর্ঘ আন্দোলনে অভিজ্ঞ নেতা অমল সেন আসেন এলাকায়। অমল সেন রাণীশংকৈলে মূলত কর্মীদের সংগে বৈঠক করেন। নড়াইলের তেভাগা আন্দোলন খ্যাত এই নেতা 'জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি' বিষয়টির ওপর জোর দেন । তার সংগে কর্মীরা আধিয়ার কৃষকদের সমস্যাটা নিয়েও কিছু আলোচনা করেন । তিনি *আধিয়ার* কৃষকদের জমি এবং জীবনের সমস্যাকে পর্যালোচনা করে বলেন যে, আধিয়ার কৃষকদের সমস্যাটা রাণীশংকৈলের মূল সমস্যা এবং জনগণের বিকল্প শক্তি তৈরীর ক্ষেত্র । উল্লেখ্য, আধিয়ার কৃষকদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে মিছিলে-শ্লোগানে কিংবা জনসভায় ১৯৭৯ সালের শেষদিন পর্যন্ত কোন বক্তব্য আসেনি। কারণ কৃষক মুক্তি সমিতি গরু চুরির বিষয়টাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলো। এবং কৃষকরাও এই ইস্যুতে ব্যাপক সাড়া দিয়েছিলেন।

৪.৬ রাজনৈতিক মঞ্চে কৃষক আন্দোলন

১৯৭৯ সালের নভেম্বর -ডিসেম্বর মাসে গণসংযোগ, গ্রামে গ্রামে *খুলি বৈঠক* এবং গ্রাম কমিটি গঠনের কাজ বেশ জোরদার হলো । কৃষক মুক্তি সমিতির এই গণসংযোগ, গ্রাম বৈঠক কার্যক্রম বস্তুত ১৯৮০ সালের শুরুতে গরু চুরি এবং হাট তোলা বিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শনের লক্ষ্যেই চলছিলো। অর্থাৎ কৃষক মুক্তি সমিতি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির কাজ করছিলো ।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যটা ছিলো গরু চুরি, হাট তোলা বন্ধ করা এবং কৃষকের উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা । কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কয়েকজন কর্মী একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতার

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখীন হন । এই ভিন্ন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিলো রাণীশংকৈলের চারটি গ্রাম — যা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে ।

দাহার মাষ্টার এবং ইশান চন্দ্র হোসেনগাঁও ইউনিয়নের বলিদ্বারা এবং আরো কয়েকটা গ্রামে গণসংযোগের দায়িত্ব নেন। তারা প্রতিটি গ্রামে তাদের লক্ষ্য এবং কর্মসূচীর কথা বলে বৈঠক করেন। বলিদ্বারা গ্রামের বৈঠকে *আধিয়ার* কৃষকরাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারা গরু চুরি বন্ধের আন্দোলনের সংগে তাদের উপর স্বাধীনতার পর থেকেই যে শোষণ এবং পুলিশী নির্যাতন চলছে— তা যুক্ত করতে বলেন । তারা দীর্ঘ হতাশা এবং ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটাতে চান । তারা তাদের হতাশার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক বর্ণাঢ্য সামাজিক উত্থানের ক্রিয়ায় মেতে উঠতে চান । *আধিয়ার* কৃষকরা ছাড়াও এই গ্রামের সর্বস্তরের লোকজন আধিয়ার কৃষকদের সমস্যাকে নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিতে বলেন । এবং কৃষক মুক্তি সমিতিকে তারা অবলম্বন হিসেবে পেতে চান— একথা স্পষ্টভাবেই বলে দেন।

হোসেনগাঁও ইউনিয়নের কলিগাঁও এবং উত্তরগাঁ গ্রামেও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'ন নয়ন মোল্লা, তসিরউদ্দীন মেম্বার এবং আনিস হোসেন । বাচোর ইউনিয়নের বাক্সা সুন্দরপুর গ্রামে একই রকম ঘটনার মুখোমুখি হ'ন কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মী কবিরুল এবং তজির হোসেন।

চার গ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময় হলো কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীদের মধ্যে । তারা আধিয়ার কৃষকদের সমস্যাটার কথা বেশ কিছুদিন আগেই জেনেছিলেন । এবং এ বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় নেতা অমল সেনের সংগেও আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টাকে আন্দোলনের ইস্যু হিসেবে খুব একটা গুরুত্ব দেননি । তারা আন্দোলনের মূল ইস্যু হিসেবে গরু চুরি, হাট তোলা বন্ধ করা — এগুলোকেই দেখেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন ।

আধিয়ার কৃষকদের গ্রামগুলোর অভিজ্ঞতা তাদেরকে চিন্তায় ফেলে দেয় । তারা যেন আন্দোলনের মূল ইস্যু থেকে দূরে অবস্থান করছেন । আর *আধিয়ার* কৃষকরা যেন মূল ইস্যুকে দেখিয়ে দিচ্ছেন; মূল ইস্যুকে ধরার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন ।

৪.৬.১ বিক্ষোভ মিছিলে আধিয়ার কৃষক

১৯৮০ সাল । জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে গরু চুরি বন্ধের ব্যাপক কর্মসূচী। বিক্ষোভ-মিছিলগুলো মিলিত হবে চৌরাস্তার মোড়ে । কৃষকরা বক্তব্য রাখবেন । কৃষক মুক্তি সমিতির স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

নেতারও বক্তব্য রাখবেন । এইভাবেই কর্মসূচীর পরিকল্পনা হয়। বস্তুত জানুয়ারী মাসের এই কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই কৃষক মুক্তি সমিতি আন্দোলনকে বেগবান করার পরিকল্পনা নেয় ।

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের রোববার দিন। কৃষকদের মিছিল । মিছিলে গরু চুরির বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়া হলো, শ্লোগান দেয়া হলো পুলিশের বিরুদ্ধে । মিছিল থেকে আরও উত্থিত হলো তহসিলদার-কানুনগোর বিরুদ্ধে শ্লোগান; *আধিয়ার* কৃষকদের ওপর জুলুমের বিরুদ্ধে শ্লোগান । চৌরাস্তার মোড়ে কৃষক বক্তারা গরু চুরির জন্য পুলিশকে দায়ী করলেন। আধিয়ার কৃষকদের ওপর নিপীড়নের প্রতিবাদ করলেন এবং এজন্য *তহসিলদার,* স্থানীয় টাউট এবং পুলিশকে সাবধান হতে বললেন ।

জানুয়ারী মাসের এই কর্মসূচী আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় । গরু চুরির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে আধিয়ার কৃষকরা জমি এবং জীবনের সমস্যাকে মিছিলে-বক্তব্যে তুলে ধরেন । অন্যান্য কৃষকরাও আধিয়ার কৃষকদের জীবনের সমস্যাকে একটা বড়ো সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করেন । গরু চুরির বিষয়টা যেন প্রধান ইস্যু নয়; প্রধান ইস্যু যেন আধিয়ার কৃষকদের জমি এবং জীবনের সমস্যাটা- এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় ।

১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে বিক্ষোভ-মিছিল কর্মসূচীর পরই 'কৃষক মুক্তি সমিতি'র লক্ষ্য সম্পর্কে রাণীশংকৈলের সর্বস্তরের লোকজনের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায় । অর্থাৎ কৃষক মুক্তি সমিতির লক্ষ্য *আধিয়ার* কৃষকদের জমির সমস্যা কেন্দ্রিক আন্দোলন— এ ধারণাটা হয় । কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা ছিলো ভিন্ন রকম । কৃষক মুক্তি সমিতি *আধিয়ার* কৃষকদের জমির সমস্যাকে আন্দোলনের ইস্যু হিসেবে দেখবে কি-না, সে সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত তখনও হয়নি। এবং এ বিষয়ে কোন প্রস্তুতিও নেয়া হয়নি।

বস্তুত জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ-মিছিল থেকে উচ্চারিত স্বতঃস্ফূর্ত শ্লোগান এবং বক্তব্য থেকে আধিয়ার-কৃষক আন্দোলনের ইস্যুটি অনেকটা সামনে চলে আসে । কৃষক মুক্তি সমিতি'র স্থানীয় নেতৃত্বের এ বিষয়ে কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিলো না এটা সত্য । তবে আধিয়ারদের জমি সংক্রান্ত এ বিষয়টাই যে রাণীশংকৈলে আন্দোলনের মূল ইস্যু— এ ব্যাপারে স্থানীয় নেতৃত্বের সব সন্দেহ মিছিলের পরই দূর হয়ে যায়। তাই কৃষক মুক্তি সমিতি অন্যান্য ইস্যুগুলোর সংগে আধিয়ার কৃষকদের জমির সমস্যাটাকে যুক্ত করার চিন্তা করে । কিন্তু কিভাবে আন্দোলন শুরু করা হবে— এ বিষয়টা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে জোরালো কোন আলোচনা হয়ে উঠেনি ।

Dhaka University Institutional Repository

এ দিকে রাণীশংকৈলের পুলিশ, ভূমি অফিস এবং স্থানীয় প্রশাসন কৃষক মুক্তি সমিতির ব্যাপারে সজাগ হয়ে যায় । এতোদিন গরু চুরি, হাট খাজনা, কৃষি পণ্যের দাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 'কৃষক মুক্তি সমিতি' সভা-সমাবেশ করেছে, পুলিশের বিরুদ্ধেও বলেছে; স্থানীয় প্রশাসন এতে খুব একটা বিচলিত হয়নি । কিন্তু জানুয়ারী মাসে কৃষকদের বিক্ষোভ মিছিলটা প্রশাসনের কাছে যেন অশণি সংকেত হয়ে দেখা দেয় ।

মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল, সলিমউদ্দীন এবং নোমান তহসিলদারদেরও হিসেব হয়ে যায় যে, মধ্যস্বত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটায় বড়ো রকমের আঘাত আসতে পারে । আর এ রকম হিসেব থেকেই তারা কৃষক মুক্তি সমিতিকে অর্থাৎ *আধিয়ার* কৃষকদেরকে দমনের জন্য পুলিশের সংগে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। এটা ছিলো তাদের নিজেদের 'কাজের' পূর্ব প্রস্তুতি ।

জানুয়ারী মাসের বিক্ষোভ মিছিলটার পর রাণীশংকৈলের বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে সমস্যাগ্রস্ত মানুষ ছুটে আসেন কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীদের কাছে। কৃষক নেতা এবং কর্মীদের দেখা পাওয়ার জন্য তারা রাণীশংকৈল, বলিদ্বারা এমনকি কর্মীদের বাড়ি পর্যন্ত ছুটে আসেন। সংগঠনের কোন স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় দূর-দূরান্ত থেকে আসা লোকজনকে এ জন্য বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু তবুও মানুষ আসেন; কৃষক মুক্তি সমিতির দাহার মাষ্টার, নয়ন মোল্লা, ইশান চন্দ্র এবং অন্যান্য কর্মীদের কাছে সমস্যার কথা বলেন ।

ইতিমধ্যেই রাণীশংকৈল এলাকার লোকজন কৃষক মুক্তি সমিতিকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। আর তাই অন্যায়ের শিকার হওয়া লোকজন আসেন— প্রতিকার পাওয়ার জন্যে । ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীরা সংগঠনের স্থায়ী ঠিকানার প্রয়োজনটা প্রচন্ডভাবে অনুভব করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন সংগঠনের স্থায়ী ঠিকানা তৈরীর। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষকদের সহযোগিতায় বানানো হয় বাঁশ-ছনের একটা বিরাট ঘর । বলিদ্বারা বাজারে তৈরী হয় এ ঘর । নাম দেয়া হয় 'কৃষক মুক্তি সমিতির আঞ্চলিক অফিস'। সংগঠনের স্থায়ী ঠিকানা হওয়ায় লোকজনের আনা-গোনাও বেড়ে যায় ।

মার্চ মাসের শেষের দিকে একদিন, কলিগাঁও গ্রামের কৃষক আবু বকর, সালেক এবং সমীরউদ্দীন বলিদ্বারা অফিসে এসে হাজির হলেন। খুব জরুরী একটা খবর আছে বলে জানালেন অফিসে বসা নেতা-কর্মীদের । এই তিনজনের মধ্যে আবু বকর বেশ বড় গৃহস্থ। নিজের তিরিশ বিঘা জমি নিজ হালেই

Dhaka University Institutional Repository

আবাদ করেন (দেখুন, পরিশিষ্ট-৫)। আর অন্য দু'জন আধিয়ার কৃষক । তিনজনই কিছুদিন আগে সংগঠনের সদস্য হয়েছেন। সংগঠনের গ্রাম কমিটিতে আছেন তারা।

তারা খবর নিয়ে এসেছেন সৈয়দ নুরুল হুদার। অর্থাৎ চার গ্রামের আধিয়ারদের জমির অবাংগালী মালিকের । সবাই অবাক ! উপস্থিত সবার জানার আগ্রহ । অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করা হলো । কারণ বিষয়টা সংগঠনের লোক বাদে অন্য কেউ জানুক— তা কর্মীরা চাননি । সালেক বললেন, সৈয়দ নুরুল হুদা দিনাজপুরে এসেছেন। নূরুল হুদার প্রতিনিধি (পাকিস্তান আমলে এই প্রতিনিধি ধান নিয়ে যেতেন) রহমত আলী কলিগাঁয়ে এসেছিলেন । নূরুল হুদার খবরা-খবর জানালেন। রহমত আলীও অবাংগালী। এতোদিন সৈয়দ নুরুল হুদার সংগেই দিনাজপুরের বাহিরে ছিলেন। রহমত আলী জমি এবং আধিয়ারদের খোঁজ নিতে এসেছিলেন । তাকে সব ঘটনা বলা হয়েছে । ঘটনা শুনে তিনি খুব অবাক হয়েছেন । বললেন, সৈয়দ নুরুল হুদা জমি বিক্রি করেননি । তিনি দিনাজপুরেই ছিলেন না, আর জমি বিক্রি করলেন কখন !

আবু বকর বললেন, রহমত আলীর সংগে আলাপের সময় তিনিও উপস্থিত ছিলেন । রহমত আলীকে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, জমি এখন অবাংগালী সৈয়দ নুরুল হুদার নয়; আর জাল দলিলকারী চেলা হোসেনসহ যারা আধিয়ারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়েছেন তাদেরও নয় । *আধিয়ার* কৃষকরা এতোদিন ধরে জমি আবাদ করেছেন—তাই জমি তাদেরই । জমি উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আধিয়াররা; আধিয়ার কৃষকরা জমি ছাড়বে না । এসব কথা শোনার পর রহমত আলী মুখ কালো করে চলে গেছেন । এই খবরগুলো দিয়ে আবু বকর, সালেক এবং সমীরউদ্দীন চলে যান ।

৪.৬.২ আধিয়ারদের সমস্যাটি আন্দোলনের প্রধান ইস্যু

দাহার মাষ্টার, নয়ন মোল্লা, ইশান চন্দ্র এবং আনিস হোসেন এই চারজন অফিস ঘরের বাহিরে এসে নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেন। চারজনই কৃষক মুক্তি সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । তারা তাৎক্ষণিকভাবে একটা সিদ্ধান্তও নিলেন । সিদ্ধান্তটা হলো আধিয়ার কৃষকদের ইস্যুটা কৃষক মুক্তি সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মানিককে ভালভাবে জানানোর । কারণ কৃষকরা এগিয়ে যাচ্ছে, বসে থাকার সময় আর নেই ।

মাহমুদুল হাসান মানিকের বাড়ি দিনাজপুর শহরে । প্রতি মাসেই রাণীশংকৈলে সাংগঠনিক আলোচনার জন্য আসেন ।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিন পরেই মানিক রাণীশংকৈলে আসলেন। তার সংগে এ বিষয়ে ব্যাপক আলাপ হয় রাণীশংকৈলের কর্মীদের । মানিক রাণীশংকৈলের অবস্থাটা ভালভাবেই বুঝে যান । *আধিয়ার* কৃষকদের জমির ইস্যুটা যে আন্দোলনের মূল ইস্যু— এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে দিনাজপুর শহরে একটা কৃষক সমাবেশ হয় । এই সমাবেশে কৃষক মুক্তি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং জাতীয় সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন আসেন । রাণীশংকৈলের নয়ন মোল্লা এবং আরো কয়েকজন এই সমাবেশে আসেন । রাণীশংকৈলের আধিয়ারদের ইস্যুটা নিয়ে রাশেদ খান মেননের সংগে আলোচনা করেন মানিক এবং নয়ন মোল্লা । রাশেদ খান মেননের কাছেও *আধিয়ার* কৃষকদের ইস্যুটা রাণীশংকৈলের ক্ষেত্রে প্রধান ইস্যু বলে মনে হয় ।

এদিকে রাণীশংকৈলে কৃষক মুক্তি সমিতির সাংগঠনিক কলেবর দিন দিন বাড়তে থাকে । কর্মীরা তৎপর। আধিয়ারদের গ্রামগুলো থেকে বেশ কিছু ভালো কর্মীও তৈরী হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন কৃষক পরিবারের বেশ কিছু যুবক প্রায় সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে গেছেন।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাণীশংকৈলে কৃষক মুক্তি সমিতির একটা মিটিং হয় । এই মিটিং-এ দাহার মাষ্টার, নয়ন মোল্লা, তসিরউদ্দীন মেম্বার, কবিরুল, ইশান চন্দ্র এবং আরো কয়েকজন স্থানীয় কৃষক নেতা উপস্থিত ছিলেন। কৃষক মুক্তি সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মানিকও ছিলেন এ আলোচনায় । আলোচনাটা সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য ছিলোনা । এই মিটিং থেকে আধিয়ার কৃষকদের আবাদে থাকা জমিগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থাৎ জমিগুলোর মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য ভালভাবে জানার সিদ্ধান্ত হয়। দাহার মাষ্টারকে দায়িত্ব দেয়া হয় তথ্য সংগ্রহের। আর এ ব্যাপারে দিনাজপুর শহরে কোন তথ্য থাকলে— তা দেখার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় মানিককে ।

তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যায় । সৈয়দ নুরুল হুদাসহ বার জনের নামে জমিগুলো —এ সম্পর্কিত কাগজ-পত্র কয়েক দিনের মধ্যেই যোগাড় করে ফেলেন দাহার মাষ্টার । কাগজ-পত্রে বারজনেরই ঠিকানা দিনাজপুর পৌর সভার বিভিন্ন মহল্লায় দেয়া ছিলো । দিনাজপুর শহরে চলে আসেন দাহার মাষ্টার । সাধারণ সম্পাদক মানিকের সংগে আলাপ করেন বিষয়টা নিয়ে। মানিক দিনাজপুর পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনার লাবুকে লোকগুলোর খোঁজ-খবর নেয়ার দায়িত্ব দেন । কমিশনার লাবু কৃষক মুক্তি সমিতির জেলা কমিটির সদস্য । লাবু পৌরসভার বাসিন্দাদের ফাইল ঘেঁটে সৈয়দ নুরুল হুদা, তার স্ত্রী হাজেরা এবং মেয়ে মাসুদার নাম পেলেন; কিন্তু বাকী নয় জনের কোন হদিশ পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

গেলো না। সন্দেহ বেড়ে যায়। তাই জমির কাগজে উল্লেখিত মহল্লার ঠিকানায় চলে যান লাবু। জিজ্ঞেস করেন মহল্লার বাসিন্দাদের, কিন্তু এই নামে কোন লোকের খোঁজ পেলেন না। বিষয়টা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ সৈয়দ নুরুল হুদা বেনামে জমি রাখার জন্যই ঐ নামগুলো ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ভূমি সিলিং আইনকে ফাঁকি দিয়ে সিলিং উদ্বৃত্ত জমি তিনি এভাবেই রেখেছিলেন। তাহলে কি নুরুল হুদার আরো এরকম জমি আছে — এ প্রশ্ন লাবুর।

লাবু, মানিক এবং দাহার মাষ্টার জেলা পর্যায়ের অফিস থেকে নূরুল হুদার জমির হিসেবও বের করেন। তারা হিসেব করে দেখেন যে, রাণীশংকৈলের ৭১২ বিঘা জমিসহ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্বনামে-বেনামে নূরুল হুদার মোট জমির পরিমাণ আড়াই হাজার বিঘা। তারপর খোঁজ নেয়া হয় ঠাকুরগাঁও মহকুমা প্রশাসকের অফিসে। এখানে ১৯৭৫ সালে রাণীশংকৈলের জমিগুলোকে পরিত্যক্ত ঘোষণার কাগজ-পত্র পাওয়া যায়।

এই তথ্যগুলো পাওয়ার পর দাহার মাষ্টার রাণীশংকৈলের কৃষক নেতা এবং কর্মীদের সংগে আলোচনা করেন। সবার কাছে আধিয়ারদের জমির ঘটনার চিত্র স্পষ্ট হয়। সলিমউদ্দীন, তমিজউদ্দীন, নোমান তহসিলদারসহ ৪৬ জন নতুন মালিক যে ভুয়া-- তা তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকদের জমিগুলোর অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়ার পর কৃষক মুক্তি সমিতির স্থানীয় নেতারা *আধিয়ার কৃষক* আন্দোলন করার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ইতিমধ্যে সাংগঠনিক অবস্থানও বেশ জোরদার হয়। সংগঠন বিকাশের জন্য কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীরা গ্রামে গঞ্জে গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন। গরু চুরি, হাট খাজনা বন্ধ, পাটের ন্যায্যমূল্যের দাবীতে প্রচারণা চলছে। পাশাপাশি আরো কিছু প্রতিবাদে কৃষক মুক্তি সমিতি নেতৃত্ব দিয়েছে— যেগুলো সংগঠনের বিকাশে ভালো ভূমিকা রাখে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি ঘটনার একটি ছিলো খাস জমি সংক্রান্ত, অন্যটি বিধবা মহিলাদের গম আত্মসাৎ সংক্রান্ত।

৪.৬.৩ সাংগঠনিক প্রস্তুতি

রাণীশংকৈলের শিবদিঘী নামে এলাকাটা অফিস পাড়া হিসেবে পরিচিত। এখানেই সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)-এর অফিস। থানা বা পুলিশ স্টেশনসহ অন্যান্য অফিসও এখানে। এই অফিস পাড়ার অনতিদূরে বেশ কিছু সরকারী খাস জমির উপর প্রায় ষাটটি পরিবার বহুদিন ধরে বসবাস করে। এই পরিবারগুলোকে বিনা কারণে মাঝে মাঝে উচ্ছেদের হুমকি দেয়া হতো। এ হুমকি কখনো ভূমি অফিস

Dhaka University Institutional Repository

থেকে, কখনও পুলিশ থেকে, আবার কখনও অফিস পাড়ার অফিসার কর্মচারী থেকে । হুমকি বলতে অন্যত্র চলে যাবার কথা বলা হতো । বস্তুত ঐ জমিগুলো ভূমি অফিসের-কর্মচারী এবং পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মচারীরা আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কলোণীর বাসিন্দাদের এই সমস্যায় কৃষক মুক্তি সমিতি এগিয়ে আসে । কৃষক মুক্তি সমিতির পক্ষে অবশ্য জোরালো যুক্তি ছিলো। ১৯৭২ সালে সরকারী খাস জমি ভূমিহীনদের দেয়ার আইন হয়, তাই আইনগতভাবে কলোণীর বাসিন্দারাই জমির মালিক হওয়ার কথা । কারণ তারা সবাই ছিলেন ভূমিহীন।

কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীরা কলোণীর লোকজনের নেতৃত্ব দেন । কলোণীর প্রায় ২০০ জন ভূমিহীন নারী-পুরুষ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সার্কেল অফিসার (রেভ.)-এর অফিস ঘেরাও করেন এবং দাবী পেশ করেন । সার্কেল অফিসার (রেভ) তাদেরকে উচ্ছেদ না করার প্রতিশ্রুতি দেন । এই ঘটনাটিও কৃষক মুক্তি সমিতির সংগঠন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক হয়।

১৯৮০ সালের মে মাসে মহকুমা প্রশাসক একটা নির্ধারিত কর্মসূচীতে রাণীশংকৈলে আসেন। রাণীশংকৈলের প্রায় তিন শত দরিদ্র বিধবা মহকুমা প্রশাসককে ঘেরাও করে । বিধবাদের জন্য বরাদ্দকৃত গম স্থানীয় প্রশাসনের আত্মসাৎ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই ঘেরাও হয়। কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীরা বিধবাদের নেতৃত্ব দেন । ঘেরাও হওয়াতে মহকুমা প্রশাসক গমের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'ন । এই ঘটনাটাও কৃষক মুক্তি সমিতির সংগঠন বিকাশে বেশ ভূমিকা রাখে ।

এগুলো বাদেও গণমুখী সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টির আকাঙ্খা থেকে 'চক্রবাক' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরী হয় । বলিদ্বারা বাজারের আশে-পাশের বড় কৃষক, মাঝারী কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের ছেলে-মেয়েরাই মূলত এই সংগঠনের সংগে জড়িত হয় । এই ছেলে-মেয়েদের বেশির ভাগই ছিলেন দিনাজপুর এবং ঠাকুরগাঁও শহরের কলেজগুলোর ছাত্র । ১৯৮০ সালের আগষ্ট মাসে এই সংগঠন তৈরী হয় । কৃষক মুক্তি সমিতির বলিদ্বারা অফিস ধীরে ধীরে এই সংগঠনেরও অফিসে পরিণত হয় । 'চক্রবাক' রাণীশংকৈলে ১৯৮০ সালের মধ্যেই বেশ কিছু সভা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । রাণীশংকৈলের সাংস্কৃতিক অংগনে সংগঠনটির গান্তীর্যপূর্ণ ভূমিকা মধ্যবিত্তদের আকৃষ্ট করে । কিছু দিনের মধ্যেই স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেই এই সংগঠনের সংগে যুক্ত হ'ন । এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি কৃষক মুক্তি সমিতির ঘনিষ্ঠ 'বন্ধু সংগঠন' হিসেবে এলাকার লোকজন এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে পরিচিত হয় । এই সংগঠনটিও কৃষক মুক্তি সমিতির বিকাশে কিছুটা ভূমিকা রাখে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে এসেছে। আমন ধান কাটা প্রায় শেষের দিকে। মাঠে যা ধান আছে তাও আর কয়েক দিনের মধ্যে কাটা শেষ হবে । আধিয়ার কৃষকরা আগের বছরের মতোই জমির ভুয়া মালিকদের *খোলানে* ধান মাড়াই করে *আধিভাগ* দিলেন। যদিও ইতোমধ্যে আধিয়ার কৃষকদের অনেকেই কৃষক মুক্তি সমিতির সদস্য হয়েছেন । প্রতিবাদের ইচ্ছাও তাদের প্রবল। কিন্তু এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত না থাকায় তারা ধানের ভাগ দেয়ার ক্ষেত্রে আগের অবস্থানেই থাকেন ।

কিন্তু ডিসেম্বর মাসেই বলিদ্বারা গ্রামে একটা ঘটনা ঘটে গেলো। বলিদ্বারা গ্রামের অধিয়ার কৃষক নফের আমন ধান কেটে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। ধান তিনি ভুয়া মালিকদেরকে দিবেন না— এ সিদ্ধান্ত নেন । সিদ্ধান্তটা তার ব্যক্তিগত। তিনি বলিদ্বারা অফিসের কৃষক নেতা এবং কর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা চান। কোন সমস্যা হলে তারা যেন পাশে থাকেন । নফের ইতিমধ্যে কৃষক মুক্তি সমিতির সদস্য হয়েছেন। বলিদ্বারা সংগঠনের অফিসে তার নিয়মিত যাতায়াতও ছিলো।

কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীরা নফের- এর প্রতিবাদ করার দৃঢ়তাকে সমর্থন করেন । এবং এ ব্যাপারে তারা একটা সিদ্ধান্তেও আসেন । বলিদ্বারা গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের সংগেও কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীরা একটা মিটিং করেন । এবং নফেরের কোন সমস্যা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেন।

নফের-এর জমির ভুয়া মালিক সলিমউদ্দীন। সলিমউদ্দীন নফেরের কাছে ধান চাইলেন। নফের না করে দিলেন । সলিমউদ্দীন ব্যাপারটা বুঝতে পারেন । চলে আসেন রাণীশংকৈল বাজারে মারফত প্রধানের কাছে । মারফত প্রধান দ্রুত যোগাযোগ করেন সারাফত মন্ডল এবং কাদের বিশ্বাসের সংগে। সলিমউদ্দীনসহ চারজনই পুলিশের কাছে যান। দারোগা নফেরকে ধরে আনার জন্য কয়েকজন পুলিশকে পাঠিয়ে দেন । পুলিশের লোকজন নফেরকে ধরে নিয়ে আসেন। মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল এবং কাদের বিশ্বাসের উপস্থিতিতে নফেরকে মারধর করা হয়।

নফেরকে ধরে আনার খবর বলিদ্বারা কৃষক মুক্তি সমিতির অফিসে দ্রুত পৌঁছে যায়। খবর পেয়েই বলিদ্বারা গ্রামের শতাধিক কৃষক বলিদ্বারা অফিসে ভীড় করে । এখান থেকে কৃষকদের একটা মিছিল—*'জীবন দেবো, ধান দেবোনা'* শ্লোগান দিতে দিতে চলে আসে থানায় । মিছিল দেখে দারোগা চমকে উঠেন! এবং দ্রুত নফেরকে ছেড়ে দেন । নফেরকে নিয়ে মিছিলটা আবার ছুটে চলে বলিদ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

কৃষক মুক্তি সমিতির অফিসের দিকে । '*কৃষক মুক্তি সমিতি জিন্দাবাদ, জীবন দেবো- ধান দেবোনা, জীবন দেবো জমি দেবোনা*' — শ্লোগান উচ্চারিত হয় মিছিলে ।

এই ঘটনার মধ্য দিয়েই *আধিয়ার* কৃষকদের জমির সমস্যাটা কৃষক মুক্তি সমিতির আন্দোলনের মঞ্চে চলে আসে; হয়ে ওঠে আন্দোলনের প্রধান ইস্যু । কৃষক মুক্তি সমিতির রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে শুরু হয় আন্দোলনের আর এক নতুন অধ্যায় ।

৪.৭ আন্দোলনের বিস্তার এবং প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ

১৯৮১ সাল। আধিয়ার কৃষক আন্দোলনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীরা উল্কার মতো ছুটে চলেছেন গ্রামে-গঞ্জে। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির বিশাল প্রস্তুতি । গ্রামে-গ্রামে শক্তিশালী কমিটি তৈরীর কাজ এগিয়ে যাচ্ছে । রাণীশংকৈলের ছাত্রদের সংগঠিত করার কাজও করে ফেলেন রিজু, গোপেন এবং ইসলাম । রিজু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গোপেন এবং ইসলাম শহরের কলেজে পড়াশুনা করেন । জানুয়ারী মাসে রাণীশংকৈল কলেজে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের শাখা গঠিত হয়। সদস্য সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন (নতুন কথা, জানুয়ারী ৩০, ১৯৮১)। 'বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন' কৃষক মুক্তি সমিতির বন্ধু সংগঠন ।

বলিদ্বারা আঞ্চলিক কার্যালয়ে চার গ্রামের *আধিয়ার* কৃষকদের নিয়ে একটা বিশেষ মিটিং হলো জানুয়ারী মাসেই । মিটিং-এ ব্যাপক আন্দোলনের জন্য চার গ্রামের কৃষকদের প্রস্তুত থাকার কথা বলা হলো ।

এদিকে 'চক্রবাক' সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য সানোয়ারা, মিনতি এবং বিনোবালার প্রচেষ্টায় গঠিত হলো ৪০ সদস্য বিশিষ্ট 'নারী মুক্তি সংসদে'র রাণীশংকৈল শাখা (নতুন কথা, এপ্রিল ৩, ১৯৮১)।

রাণীশংকৈল বন্দরের বিভিন্ন ব্যবসার সংগে যুক্ত আছেন বহু যুবক। এই যুবকরা কৃষক মুক্তি সমিতির কার্যক্রমের সংগে ইতোমধ্যে পরিচিত হ'ন। তাদের উদ্যোগে গড়ে উঠলো 'যুব আন্দোলনে'র রাণীশংকৈল শাখা (দৈনিক উত্তরা, এপ্রিল ২, ১৯৮১)।

'নারী মুক্তি সংসদ' এবং 'যুব আন্দোলন'—দু'টি সংগঠনই কৃষক মুক্তি সমিতির বন্ধু সংগঠন ।

Dhaka University Institutional Repository

ওদিকে মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল, কাদের বিশ্বাস এবং নোমান তহসিলদার ঘন ঘন আলোচনায় বসেন নিজেদের মধ্যে এবং পুলিশের সংগে । কৃষক মুক্তি সমিতির ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করে তারা নিশ্চিত হয়ে যান যে, 'চার গ্রামে মধ্যস্বত্বের' ওপর আঘাত আসবে । আঘাত কিভাবে প্রতিহত করা যায়— এটাই তাদের আলোচ্য বিষয়। দুই বিঘা করে জমি যে সাহসী এবং ডাকাত প্রকৃতির লোকদের তারা দিয়েছিলেন তাদের সংগেও গোপনে আলোচনা করেন। তাদেরকে মধ্যস্বত্ব রক্ষার জন্য হিংস্র হয়ে যেতে বলেন। ফজি, মজি, বাবুল এবং নকুলসহ দুই বিঘার মধ্যস্বত্বভোগীরা সাহস দেখনোর জন্য তাদের প্রস্তুতি আছে বলে জানান ।

আর পুলিশ । পুলিশ যে কোন ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় । কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশের প্রচন্ড রাগ । পুলিশকে তারা গরু চোর বানিয়ে ছেড়েছে, পুলিশের অনেক কাজে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে; আধিয়ার কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে— এজন্য পুলিশের রাগ ।

৪.৭.১ সমঝোতার একটি উদ্যোগ

রাণীশংকৈল এলাকার এম.পি (মেম্বার অব পার্লামেন্ট) মির্জা ঠাকুরগাঁও শহরে বসেই রাণীশংকৈলের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরা-খবর পেয়ে যান । আধিয়ার কৃষকদেরকে কেন্দ্র করে রাণীশংকৈলে বড়ো কোন ঘটনা ঘটুক— এটা তিনি চাননা । এলাকার এম.পি হিসেবে তার একটা দায়িত্বও আছে । এ বিষয়গুলো ভেবেই তিনি কোন ঘটনা ঘটার আগে একটা সমঝোতার উদ্যোগ নেন । মহকুমা পুলিশ প্রশাসককেও তিনি এ বিষয়ে বলেন । মহকুমা পুলিশ প্রশাসককে সংগে নিয়ে তিনি রাণীশংকৈলে আসেন। কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মী এবং মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল ও জমির কথিত মালিক দাবীদারদের সংগে তারা বসেন । কৃষক মুক্তি সমিতির দাহার মাষ্টার এবং অন্যরা চার গ্রামের আধিয়ারদের জমির প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেন । তথ্য জানার পর এম.পি মির্জার কাছেও বিষয়টা পরিস্কার হয়ে ওঠে। মধ্যস্বত্বভোগীদের জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন যে, তাদের দলিল ফুলবাড়ি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে পুড়ে যায়। তবে খাজনা দেয়ার রশিদ এবং মিউটেশন সংক্রান্ত কাগজ-পত্র তাদের আছে। এ সব কথা শোনার পর মির্জা সাহেব (এম.পি) আরো নিশ্চিত হ'ন যে, মধ্যস্বত্বভোগীদের কাগজ-পত্র জাল ।

সব জেনেও তিনি একটা সমঝোতার ফর্মূলা দেন । তিনি মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে ইতোপূর্বে দখল করে নেয়া জমিগুলো *আধিয়ার* কৃষকদেরকে ফেরত দিতে বলেন। এবং আধিয়ার কৃষকদেরকে ফসলের

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধেক ভাগ মধ্যস্বত্বভোগীদের দিতে বলেন । আর জমির মালিকানা সমস্যা সমাধানের জন্য দু'পক্ষকেই আদালতের আশ্রয় নিতে বলেন । দু'পক্ষই এতে রাজি হয়ে যান (নতুন কথা, জুন ২৬, ১৯৮১)।

হোসেনগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুবলকে দায়িত্ব দেয়া হয় আধিয়ারদের জমি ফেরত দেবার বিষয়টা নিশ্চিত করতে। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই সলিমউদ্দীন, তমিজউদ্দীন, আসর আলী এবং আরো কয়েকজন 'মধ্যস্বত্বভোগী' সুবল চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দেন যে, তারা ঐ আপোষ মানবেন না ।

ইতিমধ্যে কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীরা চার গ্রামের ৭১২ বিঘা জমির বৃত্তান্ত জানিয়ে তদন্তসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দরখাস্ত পাঠিয়ে দেন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে (নতুন কথা, এপ্রিল ১০, ১৯৮১)।

৪.৭.২ আন্দোলনের নতুন মোড়

১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসের গোড়া থেকে কৃষক মুক্তি সমিতির প্রচার কাজের গতি আরো বেড়ে যায়। রাণীশংকৈলের বড় বড় হাটগুলোতে *আধিয়ার* কৃষকদের সমস্যাকে নিয়ে মিছিল হয় এবং হাট সভা হয়। শত শত কৃষক মিছিলে যোগ দেয় । মিছিলে মূল শ্লোগান: *জালিয়াতদের জাল দলিল, বাতিল কর বাতিল কর* ।

রাণীশংকৈলের হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে যায় কৃষক মুক্তি সমিতির কথা, সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রতিবাদী কণ্ঠের কথা । কৃষক মুক্তি সমিতির বলিদ্বারা আঞ্চলিক কার্যালয়ে দিন-রাত লোকের সমাগম। এদিকে গ্রামাঞ্চলে ঝগড়া-বিবাদকে কেন্দ্র করে সালিশ সভা হলে কৃষক মুক্তি সমিতির কর্মীদের ডাক পড়ে। ভালো সালিসের জন্য এই সংগঠনের কর্মীদের ওপর লোকজনের প্রগাঢ় আস্থা । আর রাণীশংকৈল থানার বিভিন্ন গ্রামে সংগঠনের অনেক কমিটি হয়ে যাওয়ায় কর্মীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এই কর্মীরা স্ব-স্ব গ্রামে বিচার-সালিশে ভূমিকা রাখেন।

কৃষক মুক্তি সমিতির ব্যাপক প্রচারণায় চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকদের জমির সমস্যাটি রাণীশংকৈলের গ্রামে-গঞ্জে-বন্দরে সর্বস্তরের লোকজনের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে চার গ্রামের আধিয়ার কৃষক-কিষাণীরা আন্দোলনের ডাকের অপেক্ষায়; কেড়ে নেয়া জমি ছিনিয়ে আনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় । আধিয়ার কৃষকদের গ্রামগুলোতে রাতের চিরায়ত দৃশ্য পাল্টে যায়। নিঝুম রাত নীরব গ্রাম— এ ছন্দ যেন হারিয়ে যায় । সরব রাত অবিরত সংলাপ- এ ছন্দের দখলে

Dhaka University Institutional Repository

যেন আধিয়ার-কৃষকদের গ্রামগুলো । রাতভর ছেদহীন আলাপ-আলোচনা; 'মধ্যস্বত্বের' দৈত্যকে বিতাড়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা । জমি, ফসল, জীবন ও সংগ্রামের আলোচনা।

মধ্য এপ্রিলে বলিদ্বারা, উত্তরগাঁও, কলিগাঁও এবং বাকসা সুন্দরপুর— এই চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকরা বলিদ্বারায় জড়ো হলেন । প্রতিটি গ্রাম থেকে দশজন করে এসেছেন । কৃষক মুক্তি সমিতির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত। দিনভর আলোচনা চলে। আলোচনা কৌশল নিয়ে অর্থ্যাৎ আধিয়ার কৃষকদের কেড়ে নেয়া জমি উদ্ধারের কৌশল নিয়ে । আলোচনা শেষে 'চার গ্রাম আধিয়ার সংগ্রাম কমিটি' নামে একটা কমিটি গঠন করা হয় । এই কমিটিকে আধিয়ার-কৃষক আন্দোলনের মূল শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য এই কমিটিতে চার গ্রামের কৃষকরা বাদেও অন্যান্য গ্রামের কিছু কিছু কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । আর কৃষক মুক্তি সমিতি তো মূল নেতৃত্বে ছিলই।

চৈত্র-বৈশাখে আউস ধান বোনার সময় । এই আউস ধান বোনার মাধ্যমেই কেড়ে নেয়া জমি উদ্ধার করা হবে। তাই সিদ্ধান্ত হয় জমিতে আউস ধান বোনার । তবে এই আউস ধান বোনার জন্য জমি প্রস্তুত করতে হবে । এজন্য অনেক হালের দরকার হবে। তাই আধিয়ারদের সব হাল নামবে জমিতে । জমি চাষ করা হবে, আউস বোনা হবে। এভাবেই ছিনিয়ে আনা হবে কেড়ে নেয়া জমি । এভাবেই জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসা 'মধ্যস্বত্ব' উচ্ছেদ হবে । জাল দলিলের 'মধ্যস্বত্বভোগীদের' এভাবেই জমি থেকে বিতাড়িত করা হবে ।

কৌশলগত দিক এবং তারিখ নির্ধারণের বিষয়টা নিয়েও আলোচনা হয় । এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে, কলিগাঁও মৌজার জমি প্রথমে উদ্ধার করা হবে । অর্থাৎ কলিগাঁও-এর জমিতে আউস ধান বোনা হবে প্রথমে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, কলিগাঁও গ্রামের কৃষক এবং আধিয়ার কৃষকরাই এ অভিযানে মূল শক্তি হিসেবে থাকবে । গ্রামের কৃষকদের সমস্ত হাল নেমে যাবে মাঠে । জমি চাষ করে *আউস ধান* বোনা হবে । সারাদিন জমিতে চাষ দেয়া আর ধান বোনার কাজ চলবে ।

তবে হালচাষ আর আউস ধান বোনার কাজটা খুব সহজ হবে না — এ বিষয়টাকেও সবার মনে রাখতে হবে । মধ্যস্বত্বভোগী জাল-দলিলকারীদের সংগে আছে এলাকার দুর্ধর্ষ চোর-ডাকাতরা । রাণীশংকৈলের বাহিরেও তাদের যোগাযোগ আছে । আছে পুলিশের সংগে যোগাযোগ । মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল এবং কাদের বিশ্বাসের যোগাযোগ রাণীশংকৈলের প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। আর প্রশাসন বিশেষ করে রাণীশংকৈলের পুলিশ প্রশাসন চার গ্রামের মধ্যস্বত্বের

Dhaka University Institutional Repository

সংগে প্রায় সরাসরি জড়িত। তাই *আধিয়ার* কৃষকদের বিপক্ষে প্রশাসন শক্ত অবস্থান নিবে। কৃষক মুক্তি সমিতির প্রতিটি কর্মীর বিপক্ষে থাকবে প্রশাসন। এ জন্য লড়াই-এর সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে কৃষক-কর্মীদের। এ রকম বহু বিষয় নিয়েও খুটিনাটি আলোচনা হয়— এই মিটিং-এ । দিন-ক্ষণও ঠিক করা হলো। ২৩ এপ্রিল । ১৯৮১ সালের ২৩ এপ্রিল ।

৪.৭.৩ পুলিশ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দমনমূলক তৎপরতা

কলিগাঁও থেকে 'মধ্যস্বত্ব' উচ্ছেদ আন্দোলনের খবর মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল এবং কাদের বিশ্বাসের কাছে চলে আসে । মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ে তারাও একটা গোপন আলোচনায় বসেন । এই গোপন আলোচনা হয় পুলিশ স্টেশনের পাশে সারাফত মন্ডলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটা কক্ষে । এই আলোচনাতে রাণীশংকৈল থানার *দারোগা* (ওসি) তোফাজ্জল এবং দু'জন পুলিশও উপস্থিত হ'ন । রটনা রটে যায় যে, দারোগা তোফাজ্জল স্পষ্ট করে বলেছেন ২৩ এপ্রিল মধ্যস্বত্বভোগীদের পক্ষ থেকে চরম আঘাত হানতে হবে । দু'চারটা খুন করে আসলেও কোন অসুবিধা নেই । পুলিশ সমস্ত বিষয়গুলো দেখবে ।

কৃষক মুক্তি সমিতিকে দমন করার পদক্ষেপে পুলিশের ফর্মূলা ছিলো এটাই । দুই বিঘা জমি পাওয়া মধ্যস্বত্বভোগী লোকগুলোর সবাই এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন । আগেই বলা হয়েছে দুই বিঘা করে জমি কিছু ডাকাত প্রকৃতির লোকের নামে জাল-কাগজে রাখা হয়েছিলো। যা হউক, তারা হরিপুর থানা এবং বালিয়াডাঙ্গী থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের সংগে সম্পর্কিত লোকদের হাজির করার মত ব্যক্ত করেন । এবং এজন্য একটা খরচেরও হিসেব দেন । সলিমউদ্দীন , চেলা হোসেন, সুজা মোড়ল, নোমান তহসিলদারসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীরা খরচের ব্যাপারটা সামলানোর কথা বলেন। যতো খরচই হউক বিভিন্ন এলাকার দুর্ধর্ষ লোকদেরই এখন তাদের দরকার— এই মত মারফত প্রধানও ব্যক্ত করেন ।

এদিকে দিনের কাজ শেষে কলিগাঁও গ্রামের *আধিয়ার* কৃষকদের মধ্যে রাতভর আলোচনা চলছে । রাতের আলোচনায় অন্য তিন গ্রামের আধিয়ার কৃষকদের নেতৃস্থানীয় কৃষকরা বৈশাখের ফাঁকা মাঠের মেঠো পথ ধরে মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে চলে আসেন কলিগাঁও-এ । দাহার মাষ্টার, নয়ন মোল্লা, ইশান চন্দ্র, তজির হোসেন, তসিরউদ্দীন মেম্বার, আনিস হোসেনসহ কৃষক মুক্তি সমিতির রাণীশংকৈলের নেতৃস্থানীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক কাজ সেরে চলে আসেন কলিগাঁও-এ।

Dhaka University Institutional Repository

রাতের কলিগাঁও গ্রাম হয়ে ওঠে সংগ্রামীদের মিলন স্থল। আলোচনা হয় ২৩ এপ্রিলের । বাংলার কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসের পাতা থেকেও সংগ্রামের কাহিনী চলে আসে আলোচনায় ।

২২ এপ্রিল দিবাগত রাতে কলিগাঁও গ্রামের কৃষক আবু বকরের বাড়িতে প্রস্তুতির খুটি-নাটি সমস্ত দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এখানেই কৃষকরা লাল কাপড় ছোট ছোট করে কেটে বাঁশ খন্ডের সংগে বেঁধে শত শত লাল ঝান্ডা তৈরী করে ফেলেন। লড়াই-এর যাবতীয় হাতিয়ার (লাঠি, বল্লম, হাসুয়া, তীর-ধনুক ইত্যাদি) যোগাড় করে ফেলেন । হালের বলদগুলোকে রাতভর খাওয়ানো হয় । সারাদিন পরিশ্রমের জন্য হালের বলদগুলোকে প্রস্তুত করা হয়। এভাবেই কেটে যায় প্রস্তুতির শেষ রাত ।

২৩ এপ্রিল, ১৯৮১ সাল । সকাল বেলা আধিয়ার কৃষক এবং কৃষক নেতাদের একটি দল লাল ঝান্ডাগুলো নিয়ে মাঠে নেমে যান । আধিয়ার কৃষকরা তাদের কেড়ে নেয়া জমিতে এলেন বহুদিন পর । কেড়ে নেয়া জমির সীমানায় লাল ঝান্ডা গেড়ে দিলেন কৃষকরা । মাঠ লাল ঝান্ডায় ভরে যায় । লালে লাল হয়ে ওঠে মাঠ । তার পর চলে আসে হালের বহর । সারি সারি হাল নেমে যায় মাঠে। শত শত কৃষক *লাঠি, বল্লম, তীর-ধনুক* নিয়ে যুদ্ধের বেশে শত্রু পক্ষের আঘাতকে প্রতিহত করার অপেক্ষায়।

হাল চলছে । চাষ হয়ে যাওয়া জমিতে আউস ধান ছিটিয়ে দিচ্ছেন বেশ কিছু কৃষক। এভাবে চাষ আর ধান বোনার কাজ চলছে । বিশাল মাঠের পশ্চিম পাশের গ্রামের এক কোনায় দেখা যায় মধ্যস্বত্বভোগী দলের শতাধিক লাঠিয়ালকে । আগ্নেয়াস্ত্র বাদে সব রকমের অস্ত্র তাদের হাতে । কিন্তু তারা মাঠে নামছেন না । এভাবেই কেটে যায় দুপুর ।

প্রতিপক্ষের লাঠিয়াল বাহিনীর একজনকে দেখে হাজার জন ভয় পায়— এ রকম ধারণা ছিলো রাণীশংকৈলের লোকজনের । কারণ তাদের মধ্যে সবাই দুর্ধর্ষ । বহুজনের জমি দখল করে দেয়ার কাজ তাদের কাছে নতুন নয়। কিন্তু এই লাল ঝান্ডার দৃশ্য আর লাঠি-বল্লম হাতে কৃষক অগ্নিমূর্তি— এ দৃশ্য তাদের কাছে এবারই যেন প্রথম । মধ্যস্বত্বভোগী সলিমউদ্দীন, চেলা হোসেন, সুজা মোড়ল বার বার আঘাত হানার নির্দেশ দেওয়াতেও নামছেন না লাঠিয়ালরা । এক পর্যায়ে লাঠিয়ালের দল নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন যেন না হয়— এ চিন্তা করে বল্লম, লাঠি, রডসহ এবং অন্যান্য অস্ত্র হাতে এগিয়ে যান লাল ঝান্ডার সীমানার দিকে । *আধিয়ার* কৃষক বসাক টুডু আর অমিত হেমব্রমের ধনুক থেকে আকাশে উড়লো দু'টো তীর । লাঠি হাতে কৃষকরা হুংকার দিয়ে উঠলো । এই হুংকারেই দৌড় দিয়ে পালিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের লাঠিয়াল বাহিনী। বিকেলের দিকে তারা আর একবার আক্রমণের চেষ্টা চালায় । কিন্তু লাল ঝান্ডা আর রাজনৈতিক সাহসের কাছে পরাভূত হয়ে তারা আবার পালিয়ে যান ।

এই খবরগুলো রাণীশংকৈল থানার পুলিশের কাছে প্রতি মুহূর্তে যাচ্ছিলো । 'মধ্যস্বত্ব' রক্ষার লাঠিয়াল বাহিনীর ওপর প্রচন্ড ক্ষেপে যান দারোগা । মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল পুলিশ স্টেশনেই ছিলেন । তারাও ক্ষেপে যান মজি, ফজির নেতৃত্বাধীন লাঠিয়াল বাহিনীর উপর । মারফত প্রধান *তহসিলদার* নোমানকে দিয়ে পরাভূত লাঠিয়াল বাহিনীকে চলে যাবার নির্দেশ দেন । নোমান তহসিলদার নির্দেশ মতো ছুটে যান লাঠিয়ালদের কাছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের লাঠিয়াল বাহিনী চলে যায় ।

এদিকে বৈশাখের সূর্য্যের প্রখর তাপ কমে এসেছে । সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। আধিয়ার কৃষকদের হাল চলছেই। ধান বোনার কাজও চলছে । প্রতিপক্ষের লাঠিয়াল বাহিনীকে চলে যেতে দেখলেন কৃষকরা । কিন্তু কৃষকের বাহিনী লাঠি হাতে সতর্ক প্রহরায় তখনও ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণীশংকৈল থানার দারোগাসহ একদল পুলিশ কলিগাঁও-এর মাঠে হাজির হ'ন। পুলিশকে আক্রমণের জন্য ছুটে যেতে চায় লাঠি হাতে কৃষকের বাহিনী । কিন্তু কৃষক নেতা দাহার মাষ্টার, ইশানচন্দ্র, নয়ন মোল্লা থামিয়ে দেন কৃষকদের । পুলিশকে আক্রমণ না করার নির্দেশ দেন তারা। দারোগাসহ পুলিশের দল লাঠি, তীর ধনুক এবং অন্যান্য দেশী অস্ত্রসহ কৃষকরা কেন— এ প্রশ্ন করেন কৃষক নেতাদেরকে। প্রতিপক্ষের লাঠিয়াল বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্যই এসবের আয়োজন— এ জবাব দেন কৃষক নেতারা । দারোগা নরম সুরেই কৃষক নেতাদের বলেন, প্রতিপক্ষকে তো দেখা যাচ্ছে না । তাই আর লাঠি-সোটা হাতে কৃষকদের থাকার দরকার তো নেই । দারোগা এবং পুলিশের দল কৃষক নেতা এবং *আধিয়ার* কৃষকদের নেতৃস্থানীয় কয়েক জনের সংগে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপের প্রস্তাব দেন । তবে তারা শর্ত দেন যে, দলবদ্ধভাবে কৃষকদের থাকা চলবেনা ।

কলিগাঁও-এর কয়েকজন কৃষক এবং বিভিন্ন গ্রামের আরো কিছু নেতৃস্থানীয় কৃষক বাদে কৃষকদের চলে যেতে বলেন কৃষক নেতারা । কৃষক নেতাদের নির্দেশ মতো কৃষকরা চলে যান ।

পুলিশের দল এবং কৃষক নেতা-কর্মীরা আলোচনার জন্য বলিদ্বারার দিকে এগিয়ে যায়। পথিমধ্যে হঠাৎ দারোগা সবাইকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন । পুলিশের দলটি ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষক নেতা-কর্মীদের উপর । সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায় । এ খবর কৃষক মুক্তি সমিতির

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌঁছে যায় । তখন সন্ধ্যা। কৃষক কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ফিরে গেছেন । রাতেই সব গ্রামে সকাল বেলা থানা ঘেরাও করার খবর পাঠানো হলো ।

এদিকে রাতে ইশানচন্দ্র, নয়ন মোল্লা, আবু বকরসহ কৃষক নেতা-কর্মীদেরকে পুলিশ প্রচন্ড মারধর করেন । সারা রাত ২০ জন নেতা-কর্মীর ওপর চালানো হয় নির্যাতন । দারোগা রাতেই একটা ট্রাক যোগাড় করে রাখেন । ভোর হবার সংগে সংগে বেশ কিছু বৈদ্যুতিক তার ট্রাকে তোলা হয় । এবং বৈদ্যুতিক তার চোর বানিয়ে কৃষক নেতা-কর্মীদের পাঠিয়ে দেয়া হয় ঠাকুরগাঁও জেল-হাজতে (দৈনিক উত্তরা, এপ্রিল ২৫, ১৯৮১)।

৪.৭.৪ আন্দোলনের গণরূপ প্রকাশ

সকালে রাণীশংকৈলের কৃষক-জনতা ছুটে আসেন থানায় (পুলিশ স্টেশনে)। কৃষক নেতা-কর্মীদেরকে ঠাকুরগাঁও-এ পাঠানো হয়েছে এ খবর তারা জেনে যান। তারপর পায়ে হেটে বিশ মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঠাকুর গাঁয়ে চলে আসেন রাণীশংকৈলের হাজারো কৃষক-জনতা।

রাণীশংকৈল থেকে ঠাকুরগাঁও আসার দৃশ্যটাতেও ছিলো অভিনবত্ব। সকাল আটটার মধ্যে রাণীশংকৈল *থানার* সামনে প্রায় তিন শত কৃষক বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছুটে আসেন। তাদের প্রিয় নেতা-কর্মীদেরকে ঠাকুরগাঁও নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ খবর জানার সংগে সংগে তারা শ্লোগান তুললেন পুলিশের বিরুদ্ধে, পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে। শ্লোগান দিতে দিতে দ্রুতপদে মিছিল এগিয়ে যায় রাণীশংকৈল বাজারের দিকে। মিছিলে নতুন শ্লোগান উঠলো 'এই মুহূর্তে ঠাকুরগাঁও যাবো, কৃষক নেতাদের নিয়ে আসবো । এই মুহূর্তে ঠাকুরগাঁও যাবো, জেল খানা ঘেরাও করবো।' এই শ্লোগানের সাথে সাথে মিছিলের গতি বেড়ে যায়। মিছিল রাণীশংকৈল বাজার অতিক্রম করে পীরগঞ্জ থানার দিকে ছুটে চলে। রাণীশংকৈল বাজারের লোক-জন জেনে যায় কৃষক নেতাদের খবর; জেনে যায় মিছিলের গন্তব্যের খবর। সকাল ন'টার পর আরো প্রায় চারশত কৃষক-জনতা রাণীশংকৈল থানার সামনে চলে আসেন এবং একটা মিছিল ঠাকুরগাঁও রওয়ানা হওয়ার এ খবর জেনে যান। দেরী না করে তারাও শ্লোগান দিয়ে আগের মিছিলের পথ অনুসরণ করেন।

আগের মিছিলটা ততক্ষনে পীরগঞ্জ অতিক্রম করে শিবগঞ্জের দিকে ছুটে চলেছে। শিবগঞ্জের পরই ঠাকুরগাঁও। শ্লোগানে মুখরিত মিছিলের দিকে তাকিয়ে রাস্তার দু'ধারের মানুষ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে! কিন্তু শ্লোগানের ভাষা থেকেই তাদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সকাল এগারটার অল্পক্ষণ পরই ঠাকুরগাঁও কলেজের সামনে বড় রাস্তা পার হয়ে মিছিল এগিয়ে যায় টাংগন নদীর ব্রিজের দিকে। এই ব্রিজ পার হতে না হতেই মিছিলের গতি আরো বেড়ে যায়। সমস্ত ক্লান্তিকে হার মানিয়ে হাত উচিয়ে উচ্চ কণ্ঠে-দ্রুতপদে কৃষক-জনতার মিছিল প্রবেশ করে ঠাকুরগাঁও শহরে।

পেছনের মিছিলটাও একইভাবে কিছুক্ষণ পর চলে আসে। তার পেছনে আরও একটা মিছিল আসে। এভাবে প্রায় বার শত কৃষক-জনতা রাণীশংকৈল থেকে চলে আসেন ঠাকুর গাঁয়ে (দৈনিক উত্তরা, দিনাজপুর, এপ্রিল ২৬, ১৯৮১)

কৃষক মুক্তি সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মানিকও ঠাকুরগাঁও-এ হাজির হয়ে যান। ঠাকুরগাঁও কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় । তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। মিছিল করে মহকুমা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও করেন । ঠাকুরগাঁও-এর জনতার মধ্যেও ক্ষোভ। রাণীশংকৈলের কৃষক-জনতা বসে পড়েন জেল গেট, আদালত ভবন এবং মহকুমা প্রশাসকের অফিসের সামনে । অবস্থা বেগতিক দেখে ২৫ এপ্রিল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে সবাইকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেয়া হয় । কৃষক নেতা-কর্মীদের নিয়ে ট্রেক্তনযোগে ফিরে আসে কৃষক-জনতা।

৪.৭.৫ চূড়ান্ত পর্বে আন্দোলন

রাণীশংকৈলের কৃষক-জনতা এই ঘটনার পর পুলিশের ওপর আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যান। মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডলের রাজনৈতিক দলের একজন নেতা এবং বাচোর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরান হোসেন; নয়নপুর গ্রামের উচ্চবিত্ত দু'জন ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা জলিল এবং ওহাব মারফত প্রধান এবং সারাফত মন্ডলের ওপর রেগে যান । তারা দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে যাওয়া এবং পুলিশের দোসর হয়ে যাওয়াকে ভাল চোখে দেখছেন না— এ কথা প্রকাশ্যেই বলে বেড়ান । রাণীশংকৈলের কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা আকমল মাষ্টার, হান্নান এবং অন্যান্য কর্মীরাও কৃষক মুক্তি সমিতির নেতৃত্বে আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে আলোচনা করেন ।

এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে কৃষক মুক্তি সমিতির এক বিশাল জনসভা হয়। এই জনসভা রাণীশংকৈলের কৃষক নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে। হাজার হাজার কৃষক-জনতা পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে ব্যানারসহ শ্লোগান দিতে দিতে চলে আসেন সভাস্থলে । পাশের থানা পীরগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

থেকেও নারী-পুরুষ সমন্বয়ে মিছিল আসে জনসভায়। পুলিশি জুলুম বিরোধী এবং মধ্যস্বত্ব বিরোধী পোস্টারে ছেয়ে যায় রাণীশংকৈল বন্দরের চৌরাস্তাসহ সর্বত্র । এই জনসভায় জেল ফেরৎ কৃষক নেতা-কর্মীরা তাদের ওপর পুলিশী জুলুমের কাহিনী বলেন । জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয় । জনসভায় কৃষক মুক্তি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মানিকও বক্তব্য রাখেন (দৈনিক উত্তরা, এপিল ২৮, ১৯৮১; নতুন কথা, মে ১, ১৯৮১)।

কৃষক মুক্তি সমিতির পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলিগাঁও-এর পর উত্তরগাঁও, বলিদ্বারা এবং বাক্সা সুন্দরপুরের কেড়ে নেয়া জমি উদ্ধারের সংগ্রাম চলে। মধ্যস্বত্বভোগীদের লাঠিয়াল বাহিনীও হাজির হয় কিন্তু তাদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে সর্বত্র । আর পুলিশের প্রত্যক্ষ বাধাদানের ঘটনাও তেমন ঘটেনি। তবে পুলিশ বেছে নেয় অন্য কৌশল।

মধ্যস্বত্বভোগীদের 'মধ্যস্বত্ব' রক্ষার জন্য পুলিশ কৃষক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মামলা দায়ের করে । প্রতিটি মামলা মিথ্যা মামলা । ১৯৮১ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে ২৩ জুলাই— এই তিন মাসে আধিয়ার কৃষক এবং কৃষক মুক্তি সমিতির নেতা-কর্মীদেরকে মোট ১৩টি মামলায় আসামী করা হয় । এই ১৩টি মামলায় আসামী করা হয় মোট ২৪৭ জনকে (নতুন কথা, জুলাই ৩১, ১৯৮১)। আর এই মামলাগুলো মোটেও জমি সংক্রান্ত নয় । চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ঘর পুড়িয়ে দেয়া, ধর্ষণ— এই ছিলো মামলার ধরণ । এ সব ফৌজদারী মামলা দায়ের করে পুলিশ কৃষক-নেতা-কর্মীদের একের পর এক জেল-হাজতে পাঠিয়ে দেন ।

অন্যদিকে কৃষক নেতা-কর্মীরাও জামিন ফিরে নিয়ে আসেন একে একে । মামলাগুলো চলতে থাকে। এইভাবে আধিয়ার কৃষক আন্দোলনকে দমানোর রাস্তা বেছে নেয় পুলিশ । কিন্তু তবুও আন্দোলন এগিয়ে যায় । সংগঠন আরো বেড়ে যায় । আধিয়ার কৃষকদের জেল-হাজতে পাঠিয়ে চরম দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েও আন্দোলনের গতি থামানো যায়নি ।

কৃষকদের ওপর পুলিশী জুলুম এবং হয়রানীর খবর দিনাজপুরের খবরের কাগজগুলোতে প্রতিনিয়ত ছাপানো হয় । জাতীয় দৈনিকগুলোতেও ছোট আকারে কিছু খবর চলে আসে। এম.পি রাশেদ খান মেননসহ কয়েকজন সাংসদ জাতীয় সংসদের অধিবেশনেও পুলিশি জুলুম এবং *আধিয়ার* কৃষকদের সমস্যাটা তুলে ধরেন।

Dhaka University Institutional Repository

তেভাগা আন্দোলনের নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশের কাছেও চলে আসে কৃষক হয়রানীর খবরটা। হাজী মোহাম্মদ দানেশের বাড়ি দিনাজপুর শহরে । 'কৃষক হয়রাণী বন্ধ কর'— এই শিরোনামে রাণীশংকৈলের কৃষকদেরকে মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় জড়ানোর জন্য পুলিশকে দায়ী করে তিনি সংবাদ পত্রে বিবৃতি দেন (দৈনিক উত্তরা, আগস্ট ১০, ১৯৮১; নতুন কথা, আগস্ট ১৪, ১৯৮১)।

চার গ্রামের জমি আধিয়ার কৃষকদের দখলে । মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ এবং পুলিশের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কৃষকদের দমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত। কিন্তু কৃষকরা যখন *আমন ধান* লাগানোর জন্য মাঠে তখনও তারা সংগঠিত । ধান কাটার সময়ও তারা সংগঠিত । এই সংগঠিত শক্তিকে দুর্বল করার জন্য পুলিশের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। পুলিশের রিপোর্টে কৃষকরা হয়ে যায় চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী ও ধর্ষণকারী । আর মামলা দায়ের হলেই কৃষকদের জেল-হাজতে যেতে হয় । এ রকম একটা পরিস্থিতি রাণীশংকৈলে। আর এ রকম পরিস্থিতিতে পেশাজীবী লোকজনও এগিয়ে আসেন কৃষকদের পাশে ।

১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে রাণীশংকৈলের 'প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি' আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন দেন । শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আধিয়ার কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আর্থিক সহায়তাও দেয়া হয় (দেখুন, পরিশিষ্ট-৬) । নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বহুদিন পর আধিয়ার কৃষকরা সোনালী আমন ধান নিজের মতো করে ঘরে তুললেন । এভাবে কেটে যায় ১৯৮১ সাল।

১৯৮২ সালের জুলাই মাসে আমন ধান লাগানোর সময় উত্তরগাঁও গ্রামে মধ্যস্বত্বভোগীদের ঐ দুর্ধর্ষ দল আবারও একটা বড় রকমের আঘাত হানার প্রস্তুতি নেয় । তাদের ধারণা ছিলো মামলায় জর্জরিত কৃষকরা এখন দুর্বল; তাই জমি আবার কেড়ে নেয়া কঠিন হবে না । কৃষকরাও প্রস্তুতি নেয় । আধিয়ার কৃষকদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে মজি, ফজিদের নেতৃত্বের লাঠিয়াল দল । বড় রকমের একটা সংঘর্ষ হয় । দুর্ধর্ষ ডাকাত বলে খ্যাত মজি, ফজিসহ প্রতিপক্ষের অনেকেই কৃষকদের লাঠির আঘাতে আহত হয়। এবং লাঠিয়াল বাহিনীর সবাই পালিয়ে যায় । এই সংঘর্ষে *আধিয়ার* কৃষকদেরও কয়েকজন মধ্যে অনেকেই আহত হয় । তবে কৃষকরা জমিতে আমন ধান লাগাতে সমর্থ হ'ন । পুলিশের কাছে আহত হবার ঘটনা জানাতে যায় *আধিয়ার* কৃষকরা । কিন্তু পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেনি । অথচ এই ঘটনায় রাহাজানি এবং খুনের অভিপ্রায়— এই নামে দু'টো মামলা সাজিয়ে প্রায় ৪০ জন কৃষককে গ্রেফতার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে এই আন্দোলনের ফলে পুলিশ বিরোধী, মধ্যস্বত্ব বিরোধী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটা ধারা রাণীশংকৈলে গড়ে ওঠে । রাণীশংকৈলের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও একটা পরিবর্তন আসে ।

নিছক অবাস্তব বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত নাটকের জায়গা দখল করে নেয় বাস্তবতার ছাপ মাখানো নাটক । মঞ্চস্থ হয় 'ইতিহাসের পদধ্বনি' এবং এমন আরো অনেক জীবন ধর্মী নাটক । ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন দেখিয়ে পুলিশ নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে বাধা দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এ সব নাটকের চরিত্র রূপায়নে উত্তর গায়ের কৃষক নন্দন, বলিদ্বারার আধিয়ার কৃষকের ছেলে কিরণকে যেমন দেখা যায়; তেমনি দেখা যায় নয়ন পুরের বড় কৃষকের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইসলামকেও। দেখা যায় স্কুল শিক্ষক মোফাজ্জল এবং কলেজ শিক্ষক মনির হোসেনকেও । রাণীশংকৈলে গড়ে ওঠে একটা সংগীত বিদ্যালয় । সংগীতেও আসে পরিবর্তন । গণ সংগীতের বিদ্রোহী ধারার পাশাপাশি ধ্রুপদী সংগীত সাধনাও চলে। এ সবই *আধিয়ার* কৃষক আন্দোলনের প্রভাব।

কিন্তু মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল, কাদের বিশ্বাস এবং প্রশাসন ও পুলিশ মধ্যস্বত্বের হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবার ষড়যন্ত্র বাদ দেয়নি । ক্ষমতাধর পুলিশ কৃষক নেতাদের চোর-ডাকাত বানিয়ে যখন সুবিধা করে ওঠতে পারছেন না, তখন আরো কিছু নতুন ফন্দি আটেন। নভেম্বর মাসে আধিয়ার কৃষকদের লাগানো ধান কাটার জন্য আর একটা প্রচেষ্টা নেয় মধ্যস্বত্বভোগীরা । কিন্তু কৃষকদের সংগ্রামী মেজাজে তারা ভয় পেয়ে যান। পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় *দারোগা* এবং মারফত প্রধানদের হুকুমের ছাড়-পত্র পেয়ে চোর-ডাকাতরা রাতে বলিদ্বারার হিন্দু কৃষকদের নিজেদের জমিতে লাগানো ধান কেটে নিয়ে যায়। আর গরু চুরির ঘটনাটাও ঘটে। এসব পরিস্থিতিকেও সামাল দেয় কৃষক মুক্তি সমিতি (নতুন কথা, নভেম্বর ২৬, ১৯৮২)। কিন্তু এক পর্যায়ে কৃষক মুক্তি সমিতির কৃষক নেতা দাহার মাষ্টার ও নয়ন মোল্লাকে গোপন পার্টির সদস্য এবং খুনী বানিয়ে গ্রেফতার করে পাঠানো হয় 'দিনাজপুর আঞ্চলিক সামরিক ট্রাইব্যুনালে।' উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের মার্চে সামরিক শাসন আসার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাদের ভাষায় 'দুস্কৃতিকারীদের' বিচার করা হয়। আর রাণীশংকৈলের দারোগা দুস্কৃতিকারী হিসেবে দাহার মাষ্টার এবং নয়ন মোল্লাকে পাঠিয়ে দেন ট্রাইব্যুনালে কঠোর শাস্তির আকাঙ্খায় । কিন্তু সামরিক ট্রাইব্যুনালের মিলিটারীর লোকজন দাহার মাষ্টার এবং নয়ন মোল্লার বিবৃতিকে দারোগার পাঠানো অভিযোগের সংগে মেলাতে পারেননি । তাই শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালের শেষের দিকে মারফত প্রধান, সারাফত মন্ডল, কাদের বিশ্বাস ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে কৃষক মুক্তি সমিতির আন্দোলনে ভাঙ্গনের অন্য রকম একটা প্রচেষ্টা নেয়া হয় । হোসেনগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুবল এবং আরো কয়েকজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতৃস্থানীয় লোককে ডেকে হিন্দুদের কৃষক মুক্তি সমিতি ত্যাগ করার জন্য তারা চাপ সৃষ্টি করতে বলেন । সুবল চেয়ারম্যান এবং অন্যান্যরা মারফত প্রধানদের দলেরই। তারা চাপ সৃষ্টি করতে পারেননি। তবে বলিদ্বারার হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে বিষয়টা জানান। উল্লেখ্য যে, বলিদ্বারা বাজারে ইশান চন্দ্রসহ বেশ কয়েকজন কৃষক-নেতার বাড়ি। ওখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকজনের প্রায় সবাই কৃষক মুক্তি সমিতির সংগে জড়িত। এ ঘটনা জানার পর অনেকের মধ্যে কিছুটা সংশয় আসে। তবে ইশান চন্দ্র এবং কৃষক মুক্তি সমিতির উদ্যোগে দ্রুত সংশয় কেটে যায়।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাণীশংকৈলের কৃষক, আধিয়ার কৃষক এবং কৃষক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টা । এই মামলাগুলোতে আসামী করা হয় মোট ৯০৯ জনকে (হোসেন; ১৯৯৬: ২০১)। ইতোমধ্যে আধিয়ার কৃষকদের জমির সমস্যাকে কেন্দ্র করে জেলা, বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কয়েকটি তদন্ত টিম আসে। তদন্ত টিমের রিপোর্টেও জমিগুলোর মালিক দাবীদার সলিমউদ্দীন-নোমান তহসিলদারদের ভুয়া মালিক বলে চিহ্নিত করা হয় । কিন্তু আবার ঐ কাগজ-পত্র ভূমি প্রশাসনের বিভিন্ন অফিসে আটকে যায় । তদন্ত রিপোর্ট মূল্যহীন হয়ে যায় । আবার তদন্ত হয়— এমনিভাবে চলতে থাকে । *আধিয়ার-কৃষকরা* জমি পাবার জন্য আন্দোলন করে জমি দখলে পেলেন। কিন্তু দখলি জমির কাগজ-পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া এতো জটিল যে, কৃষকরা তা কোন দিন পাবেন— এমন আশার ক্ষেত্রে হতাশায় নিমজ্জিত।

১৯৮৬ সালে বাক্সা সুন্দরপুরের জমি দখলের জন্য মধ্যস্বত্বভোগী এবং পুলিশের পক্ষ থেকে আধিয়ার কৃষকদের উপর আর একবার আঘাত হানা হয়। বড় রকমের একটা সংঘর্ষ হয় । উভয় পক্ষের অনেকেই হতাহত হয় । রংপুরের চরাঞ্চল থেকে কয়েকজন লাঠিয়ালকে জমি দেবার নামে এনেছিলেন মধ্যস্বত্বভোগীরা । এই লাঠিয়ালদের মধ্যে একজন গুরুতরভাবে আহত হয় এবং চিকিৎসার অভাবে পরে মারা যায়।

এবারে পুলিশ কৃষক আন্দোলনের ৬২ জন নেতা-কর্মীকে খুনের আসামী বানিয়ে দেয়। ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে আধিয়ারদের গ্রামগুলোতে । জেল-হাজতে যেতে হয় কৃষক আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় মধ্যস্বত্বভোগীদের লোকজন মাঠে নেমে যান জমি দখলের জন্য । আধিয়ার কিষাণীরাও এবার দলবদ্ধভাবে নেমে যান এবং দখল প্রতিহত করেন । মহিলাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ আসছে—এমন একটা অবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীরা আধিয়ার গ্রামগুলো থেকে বেশ দূরত্বে থাকা কিছু কিছু জমি দখল করেন । কিন্তু গ্রাম সংলগ্ন জমিগুলো দখল করতে সাহস পাননি । কিছু দিনের মধ্যেই আবার চলে আসেন কৃষক নেতা-কর্মীরা । এদিকে মামলাগুলো একের পর এক মিথ্যা প্রমাণিত হয় আদালতে । কিন্তু ভোগান্তি এবং বিশাল অর্থব্যয় চেপে বসে কৃষক মুক্তি সমিতি এবং আধিয়ারদের ওপর।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আসে । নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হ'ন বহু মামলার আসামী কৃষক মুক্তি সমিতির তসিরউদ্দীন। সদস্য পদেও কয়েকজন বিজয়ী হ'ন । ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে রাণীশংকৈল-পীরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হ'ন কৃষক মুক্তি সমিতিরই পীরগঞ্জের একজন নেতা ।

কৃষকদের দ্বারা নির্বাচিত চেয়ারম্যান কিংবা জাতীয় সংসদ সদস্যের আন্তরিকতার অভাব ছিলোনা। কিন্তু পুলিশের মিথ্যা মামলা দায়ের রোধ করা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যেমন সাধ্যের বাইরে, তেমনি ভূমি প্রশাসনের অতল গহব্বর থেকে আধিয়াদের জমিতে আধিয়ারদের মালিকানা নিশ্চিত করে দেয়াও তাদের সাধ্যের বাইরে। আধিয়ার কৃষকদের জমির সমস্যা যেন সমাধানের নয় । কৃষকদের ভোটের জোরে একজন নির্বাচিত হতে পারেন কিন্তু সমস্যা সমাধান নির্বাচিতদেরও নাগালের বাইরে। এ উপলব্ধি কৃষকদের।

রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের বহুমাত্রিক ফলাফল হয়েছে। রাণীশংকৈলের মানচিত্র ছাড়িয়েও আশে-পাশের থানাগুলোতে-এর ঢেউ লেগেছে— এটা সত্য । কিন্তু আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলন করেই যেতে হচ্ছে। তাদের কাছে আন্দোলনের বিকল্প যেন আন্দোলনই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের ঘটনা, ব্যাপকতা, পক্ষ-প্রতিপক্ষের অবস্থান, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, আন্দোলনের নেতৃত্ব, প্রভাব এবং ফলাফল সম্পর্কিত একটা বিস্তৃত চিত্র পাওয়া যায়। আন্দোলনের এই বিস্তৃত চিত্রের সূত্র ধরে একটা ধারাবাহিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। আর এই ধারাবাহিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন স্পষ্ট হয়ে উঠবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হয় । এখানে ক্ষমতাসীন দল বলতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কথাই বলা হচ্ছে ।

২. 'কৃষক মুক্তি সমিতি' বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কৃষক ফ্রন্ট ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্লেষণ ও উপসংহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাণীশংকৈলের আন্দোলনের সূত্রপাত ভূমির উপর *অধিকারের* প্রশ্ন নিয়ে না ঘটলেও সেই প্রশ্নটিই শেষ পর্যন্ত মূখ্য হয়ে দেখা দেয়। আবার চার গ্রামের *আধিয়ারদের* জমির উপর অধিকারের প্রশ্নকে সামনে রেখে আন্দোলনটি প্রবল রূপ পরিগ্রহ করলেও সে আন্দোলনের পরিধি শুধুমাত্র চারটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; ছড়িয়ে পড়ে আশে-পাশের গ্রাম, ইউনিয়ন এবং সমগ্র রাণীশংকৈল এলাকাতে। জমির সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিলোনা, যারা ভূমিভিত্তিক অর্থনীতির সাথে আদৌ জড়িত নয় এমনি ধরনের ছাত্র, পেশাজীবী এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীও আন্দোলনের পক্ষের শক্তি হিসেবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এমনকি যারা শ্রেণীগতভাবে ভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগে অভ্যস্ত এমন ধরনের মানুষও উক্ত চার গ্রামের *আধিয়ার কৃষকদের* দাবীর স্বপক্ষে মেরুভূত হয়। সকলেই প্রবলভাবে নৈতিক সমর্থন জানায় আন্দোলনকারীদেরকে। জনসাধারণের ব্যাপক অংশ হয়ে দাঁড়ায় আন্দোলনের পক্ষ।

মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে নানা শ্রেণীর মানুষ থাকলেও এলাকার জনসাধারণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মধ্যস্বত্বভোগীদের লাঠিয়াল সমাবেশ, পুলিশ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সমর্থনও উক্ত মেরুভবন প্রক্রিয়াকে স্তিমিত করতে পারেনি। বরং মধ্যস্বত্বভোগী ও পুলিশের অযৌক্তিক উদ্যোগের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর ঐক্য ও সংগ্রামী মনোভাব আরো দৃঢ় হয়; স্থানীয় জন-জীবনে দেখা দেয় ব্যাপক জাগরণ। পশ্চাদপদ একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল হঠাৎ করে একটি ঝাকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কুরুচীপূর্ণ যাত্রা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মূখ্য জায়গাটা দখল করে নেয় সমাজের ব্যাপক সাধারণ মানুষ। গণনাট্য রচনা ও মঞ্চায়নে তৎপর হয়ে উঠে স্থানীয় সমাজ। সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ, সংগীত বিদ্যালয় ও পাঠাগার নির্মাণের মতো ঘটনাও ঘটে।

সর্বোপরি যে সংগঠনের নেতৃত্বে রাণীশংকৈলের আন্দোলন সংঘটিত হয় আন্দোলনের প্রারম্ভে তাতে ছিলো হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী। কিন্তু কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় হাজারও কর্মী ও সমর্থকের সমাবেশ ঘটে সংগঠনটির পতাকা তলে। যার ফলে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো বৃহৎ ঘটনায় নিজেদের দলীয় প্রার্থীদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

জয়যুক্ত করা সম্ভব হয়েছিলো। জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সাথে উপরোক্ত সব ঘটনার আন্তঃসম্পর্কটি চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের সামজতত্ত্ব ফুটে উঠবে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে যে, চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকরা উনিশত পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এলাকার বাইরে থেকে রাণীশংকৈলে এসেছিলেন এবং *আধিয়ার* কৃষক হিসেবে একজন অবাঙ্গালী ভূস্বামীর জমি চাষাবাদ শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে বর্গাদার হিসেবে জমি চাষাবাদ করা সত্ত্বেও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বর্গাকৃত জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রশ্ন তাদের মধ্যে জাগেনি। এমনকি, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যখন অবাঙ্গালী ভূস্বামীর জমিগুলো মালিকানাহীন হয়ে পরেছিলো তখনও তাদের মধ্যে এ ধরনের কোন ইচ্ছা জাগরিত হয়নি যার উপর নির্ভর করে তারা জমির উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করতে পারে। আর এ রকম একটি অবস্থায় তৎকালীন শাসক দলটির স্থানীয় নেতৃত্ব যখন ফসলের অংশ দাবী করে তখন প্রায় বিনা বাক্যে তারা তা প্রদান করেন । আপত্তি করলে কোন ফল হতো কিনা কিংবা তাদের জীবনে কোন ঝুকি নেমে আসার সম্ভাবনা ছিলো কিনা– এসব প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো আধিয়ার কৃষকরা তখনও পর্যন্ত ফসলের সব অংশ নিজেরাই রাখবেন এমন কোন নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পাননি।

এ ঘটনার দ্বিতীয় একটি দিক হলো, ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত তৎকালীন শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্ব আধিয়ারদের কাছ থেকে নিয়মিত ফসলের অংশ গ্রহণ করেছে কিন্তু গ্রামবাসী বা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেউ এ ধরনের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। অবশ্য প্রতিপক্ষ কোন রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয় উপস্থিতির অভাবই-এর পেছনের কারণ হতে পারে। এ কথাও বেশ স্পষ্ট যে, *আধিয়ার কৃষকদের* কাছ থেকে ফসলের ভাগ গ্রহণকে যে সকলে পছন্দ করেছিলো তা নয়। তৎকালীন শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্ব মূলত উক্ত চার গ্রামের বাইরের লোক হওয়ায় ফসলের অংশ নিয়ে তারা কী করতেন আধিয়ার কৃষকদের পক্ষে তা বোঝার উপায় ছিলো না। আধিয়ারদের বিবেচনার দিক থেকে দেখলে, ফসলের অংশ প্রদানকে সরকারের ঘরে রাজস্ব প্রদানের সমার্থক বলেই তাদের কাছে গণ্য হতো। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন না হলে এ অবস্থাটা হয়তো প্রশ্নহীনভাবে আরো বহুদিন চলতো। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে এবং ১৯৭৫ সালে আধিয়ার কৃষকদের একসনা বন্দোবস্ত গ্রহণের পর থেকেই আকস্মিকভাবে অবস্থাটি পাল্টে যায়। *আধিয়ার* কৃষকরা জমির উপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা ন্যায্য ভিত্তি পেয়ে যায়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আগেই যদি তারা একসনা বন্দোবস্ত গ্রহণের সুযোগ পেতো তাহলে হয়তো অন্য রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো। হয়তো সরকারী দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ফসলের ভাগ আদায় থেকে বিরত থাকতে

Dhaka University Institutional Repository

চাইতো না। আধিয়ার কৃষকরা প্রতিবাদ করলে হয়তো পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করা হতো। এমন আরো অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ক্ষমতাচ্যুত রাজনৈতিক শক্তির স্থানীয় নেতৃত্ব হিসেবে মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীটির মালিকবিহীন জমি এবং *আধিয়ারদের* উপর প্রভূত্ব করার সকল যৌক্তিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই ১৯৭৫ সালে একসনা বন্দোবস্ত গ্রহণ সাপেক্ষে আধিয়ার কৃষকরা নির্বিঘ্নে জমির দখল এবং ফসল ভোগ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু নির্বিঘ্ন অবস্থাটা শুধুমাত্র ঐ দু'বছরের জন্যই । অবশ্য পরবর্তী দু'বছরও তারা জমির দখল এবং ফসল ভোগ করেছিলেন কিন্তু সে প্রক্রিয়াটা মোটেও নির্বিঘ্ন ছিলো না। তহসিল অফিসে বার বার যেয়েও *আধিয়ার কৃষকরা* পরবর্তী বছরগুলোর জন্য একসনা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হননি। ইতোমধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারচ্যুত স্বার্থগোষ্ঠীটি তাদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ন্যায্য ভিত্তির সন্ধান করেছিলো। থানা ভূমি দফতরের জনৈক তহসিলদারের সাথে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে শুন্যতা পূরণ হয়ে যায়।

রাণীশংকৈলের আন্দোলনের আলোচনায় ইতোমধ্যে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়েছে যে, মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে স্থানীয় ভূমি অফিস-সৃষ্ট জাল কাগজ-পত্রের মাধ্যমে জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার একটা ভিত্তি দাঁড় করানোর সময়ই জমি দখলের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিলো। এবং জমি দখলের এ প্রক্রিয়ায় তারা পুলিশের সহযোগিতার উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করেছিলো । *আধিয়ার কৃষকরা* তখনও সংগঠিত ছিলো না; তথাপি মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থ-গোষ্ঠী আধিয়ার কৃষকদের জমি দখলের সাহস করেনি বরং একটা প্রবল বাধার সম্মুখীন হওয়ার আশংকাই করেছিলো। আর এ কারণেই তারা জমি দখলের পরিকল্পনায় পুলিশের সহায়তা ও ভূমিকা নিশ্চিত করেছিলো ।

স্থানীয় ভূমি অফিসের জনৈক তহসিলদারের সহায়তায় জাল কাগজ-পত্র প্রণয়নের কাজটি ছিলো মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর একটি অন্যায় উদ্যোগ এ বিষয়ে আমরা পূর্বেহেই উল্লেখ করেছি। এই অন্যায় উদ্যোগের বাস্তবায়নে অর্থাৎ জাল কাগজ-পত্রের বলে আধিয়ার কৃষকদের জমি দখল করে নেয়ার জন্য পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার বিষয়টি ছিলো আর একটি অন্যায় উদ্যোগ। এসব অন্যায় উদ্যোগের বাস্তবায়নে ভূমি অফিস এবং স্থানীয় প্রশাসন স্থানীয় স্বার্থগোষ্ঠীর মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলো। আধিয়াররা স্থানীয় জনসমাজের একটা বৃহত অংশ হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসন বা রাষ্ট্র বস্তুত আধিয়ার কৃষকদের ন্যার্য্য অধিকারের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিলো। স্থানীয় প্রশাসন তথা রাষ্ট্রের এ সুনির্দিষ্ট পক্ষপাতিত্বের কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সম্পর্কিত কিনা তা

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনার দাবী রাখে। এবং স্থানীয় প্রশাসনের এ রকম একটি অবস্থান নেয়ার পেছনে আরো কি কি কারণ কাজ করেছিলো তাও ব্যাখ্যার বিষয় ।

প্রথমতঃ নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য রাণীশংকৈলের স্থানীয় প্রশাসন তথা রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছিলো কিনা সে সম্পর্কিত আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা শ্রেণী সম্পর্কে সামজবিজ্ঞানীদের ধারণা এবং এ ধারণার আলোকে রাণীশংকৈলের আন্দোলনে শ্রেণীসমূহের অবস্থান এবং রাষ্ট্রের বিষয়টিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করবো। কারণ আন্দোলনে রাষ্ট্র এবং শ্রেণী সম্পর্কের বিশ্লেষণটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মার্কস এবং ওয়েবারের মতে শ্রেণীকে প্রধানত অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সম্পর্ক, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে (গার্থ এবং মিলস, ১৯৫৮: ১৮৬-১৮৭)। রাণীশংকৈলের আন্দোলনে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থ-গোষ্ঠীর শ্রেণী অবস্থান চিহ্নিত করণে ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি যে, কোন নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর সদস্যই কেবল এর সদস্য নয়। ভূমিভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসের দৃষ্টিতে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর এবং এলাকার বেশ কিছু দুর্ধর্ষ ডাকাত ব্যক্তির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিলো মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি। এবং তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে স্বার্থগোষ্ঠীটি পরিচালিত হতো। অর্থনৈতিক অবস্থান বিচারে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি যেহেতু এককভাবে কোন শ্রেণীর পরিচয় বহন করেনি সেহেতু একথা বলা সঙ্গত হবে যে স্থানীয় রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর স্বার্থ- রক্ষার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করেনি। আবার রাষ্ট্র যে স্বার্থগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করেছিলো তার সংগে জনসমাজের বিরোধও ছিলো। রাণীশংকৈলের আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং প্রশাসন তথা রাষ্ট্রের-এ সম্পর্কগুলো প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন।

রানীশংকৈলের আন্দোলনে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি জনসমাজের জনবিচ্ছিন্ন অংশ হওয়ায় সমাজের শক্তির উপর ভর না করে রাষ্ট্র শক্তির উপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি। রাষ্ট্রের উপর মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর এ নির্ভরশীলতা এবং অযৌক্তিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্র স্বার্থগোষ্ঠীর সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোন স্বার্থগোষ্ঠীর সহযোগী না ঐ নির্দিষ্ট স্বার্থ-গোষ্ঠীটিকে রাষ্ট্র পরিচালনা করে এটা একটা বিতর্ক এবং এ বিষয়টাও পরিষ্কার করা জরুরী। রাণীশংকৈলের মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর উত্থান পর্বে অথাৎ ১৯৭২-৭৩ সালের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, স্বার্থগোষ্ঠীটি তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের অংশ হওয়ায় ঐ সময় স্বার্থগোষ্ঠীটিকে রাষ্ট্রের সহযোগিতার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়ে উঠেনি। কিন্তু পরবর্তীতে স্বার্থগোষ্ঠীটির সংগে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতাসীন না থাকায়, অর্থাৎ ১৯৭৫ সাল পরবর্তীকালে, মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর সংগে রাষ্ট্রের সহযোগিতার বিষয়টি দৃশ্যমান হয়ে উঠে। মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের এ রকম সহযোগিতার ভূমিকা থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে রাণীশংকৈলে প্রশাসন তথা রাষ্ট্র ছিলো মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটির মতোই জনবিচ্ছিন্ন। তবে রাণীশংকৈলের প্রশাসন তথা রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অংশ হওয়ায় অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাই জনবিচ্ছিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী জনবিচ্ছিন্ন প্রশাসনের শক্তির উপরই নির্ভরশীল ছিলো এবং যৌথ উদ্যোগে আধিয়ার কৃষকদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলো।

মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর লোকজন আধিয়ার কৃষকদের জমি দখল করার ক্ষেত্রে একটা প্রতিরোধের আশংকা করেছিলো। এ ঘটনা থেকেও বোঝা যায় যে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটির সমাজে অবস্থান কি ছিলো। মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি এককভাবে আধিয়ার কৃষকদের জমি দখল করতে না যাওয়ার পেছনে তাদের জনবিচ্ছিন্নতা ছিলো প্রধান কারণ। আর জনবিচ্ছিন্নতার মূলে ছিলো তাদের অযৌক্তিক উদ্যোগ। এবং এই অযৌক্তিক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলো স্থানীয় ভূমি প্রশাসন এবং স্থানীয় রাষ্ট্র। তাই রাণীশংকৈলের মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীকে শ্রেণী সমূহের বিকাশ, উৎপাদন সম্পর্কে ভূমিকা এবং শ্রেণী সম্পর্কের বিবেচনা থেকে বিচার করা যায় না বরং স্বার্থগোষ্ঠীটিকে রাষ্ট্র প্রক্রিয়ার ফসল হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। কারণ সেখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তসহ নানান পেশার লোকের সমন্বয় ঘটেছিলো রাষ্ট্র প্রক্রিয়ার অশুভ ইঙ্গিতে। এবং তা পরিচালিতও হয়েছিলো রাষ্ট্রশক্তির উপর ভর দিয়ে। তাই রাণীশংকৈলের প্রশাসন বা রাষ্ট্রকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর আজ্ঞাবহ বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। এবং তাছাড়া রাণীশংকৈলের আন্দোলনের ঘটনাগুলোতে রাষ্ট্রকে যেহেতু জনসমাজের পক্ষে কোন পদক্ষেপ নিতে কিংবা নিরপেক্ষ থাকতেও দেখা যায় নি, সেহেতু এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, রাণীশংকৈলে রাষ্ট্র এবং জনসমাজের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক অনুপস্থিত ছিলো।

দ্বিতীয়তঃ রাণীশংকৈলের আধিয়ার কৃষকরা অসংগঠিত থাকা অবস্থায় পুলিশের সহযোগিতায় তাদের জমি দখল করে নেয়া হয়েছিলো এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি এককভাবে জমি দখলের উদ্যোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সম্মুখিন হওয়ার আশংকা করেছিলো। বস্তুত মধ্যস্বত্বের পুনরুত্থান প্রক্রিয়াটি ছিলো রাণীশংকৈলের আন্দোলনের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ বিষয়টির মধ্য দিয়েও মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর শ্রেণী অবস্থান এবং আধিয়ার কৃষকদের শ্রেণী অবস্থানসহ রানীশংকৈলে অন্যান্য শ্রেণী এবং রাষ্ট্রের ভূমিকার একটি ব্যাখ্যা বিবেচনায় আনা যেতে পারে। এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর বাধা পাওয়ার আশংকার সমাজতাত্ত্বিক দিকটিকেও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতে পারে। শ্রেণী এবং রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকার পাশাপাশি আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের প্রসংগটিরও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর বাধা পাওয়ার আশংকার ব্যাপারটি থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে আধিয়ার কৃষকরা অসংগটিত হলেও বৈধ ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের এই বৈধ ভিত্তির মূলে ছিলো প্রায় দু'যুগ ধরে নিজ *হালে* জমি আবাদে রাখা এবং অবাঙ্গালী মালিকের অনুপস্থিতির এক পর্যায়ে একসনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমি আবাদ করার সুযোগ পাওয়া। এই বৈধ ভিত্তিগুলোর কারণে তাদের জন সম্পৃক্ততায় ছেদ ঘটেনি। যে কারণে তারা জনসমাজের অংশ হিসেবে জনসমাজের সমর্থন পাওয়ার উপযোগী হয়ে উঠেছিলো। এবং আধিয়ার কৃষকদের বৈধ ভিত্তি সম্পর্কে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি অবগত ছিলো; যে কারণে তারা রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ছাড়া জমি দখল করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচন্ড বাধা পাওয়ার আশংকা করেছিলো।

মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর সদস্যরা আধিয়ার কৃষকদের গ্রামগুলোর লোক ছিলেন না। তারা আধিয়ার কৃষকদের গ্রামগুলোর হলে রাষ্ট্র শক্তি ছাড়াই জমি দখলের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারতো এমন ভাবা যায় না। কারণ মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর জমি দখলের উদ্যোগটাই ছিলো অযৌক্তিক। তবে ঐ নির্দিষ্ট গ্রামগুলোর লোকজনই মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীর একটা বড় অংশ কেন হয়নি - তা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, স্কুল শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার লোকদের সমর্থনের বিষয়টিকে বিবেচনায় আনি তাহলে এটা স্পষ্ট হয় যে, ঐ নির্দিষ্ট গ্রামগুলোর উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তরা কিংবা অন্য কোন শ্রেণী ও পেশার লোকেরা গ্রাম সম্প্রদায়ের মানুষের আকাঙ্ক্ষার বাইরে যেতে চাননি। অর্থাৎ কোন অযৌক্তিক উদ্যোগের সংগে সম্পৃক্ত হয়ে গ্রাম সম্প্রদায় থেকে তারা জনবিচ্ছিন্ন হতে চাননি।

কিন্তু এটাও দেখা গেছে যে, ১৯৭৮ সালে যখন পুলিশের সহযোগিতায় আধিয়ার কৃষকদের জমি মধ্যস্বত্বভোগীরা দখল করে নেয় তখন অসংগঠিত আধিয়ার কৃষকরা উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এবং আধিয়ার কৃষকদের গ্রামগুলোর লোকজনও প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসেনি। কেন আধিয়ার কৃষকরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি; কেন-ই বা আধিয়ার কৃষকদের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা প্রথম দিকে অন্যায় উদ্যোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। প্রসঙ্গত কৃষকদের শ্রেণীগত অবস্থান এবং গ্রামবাসীদের শ্রেণীগত অবস্থানের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। কারণ শ্রেণীগত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382828

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থানের কারণে আধিয়ার কৃষকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোর বিভিন্ন শ্রেণী এবং পেশার লোকজনের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক বিরাজ করছিলো— তা দেখার বিষয়।

ভূমি মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত ইতোপূর্বেকার আলোচনায় দেখা গেছে আধিয়াদের চার গ্রামের পরিবারগুলি মূলত চারটি ভূমিভিত্তিক শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ শ্রেণীগুলোর মধ্যে রয়েছে বড় খামার মালিক (গ্রামগুলোর মোট ৯১৭টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫৬টি পরিবার), মাঝারী খামার মালিক (৯১৭ পরিবারের মধ্যে ২৬২টি পরিবার), ছোট খামার মালিক (৯১৭ টি পরিবারের মধ্যে ৩৬৪টি পরিবার) এবং ভূমিহীন (৯১৭টি পরিবারের মধ্যে ২৩৫টি পরিবার)। আধিয়ার কৃষকদের শ্রেণীগত অবস্থান চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, তারা ছোট খামার মালিক এবং ভূমিহীন- এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ আধিয়ার কৃষকদের মধ্যে ভূমিহীন ছিলেন এবং স্বল্প জমির মালিকও ছিলেন। মাঝারী খামার মালিক বা মধ্যবিত্ত কৃষক এবং বড় খামার মালিক বা উচ্চবিত্ত লোকজনের উপস্থিতিও গ্রামগুলোতে বেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে আধিয়ার কৃষকদের পক্ষে থাকার বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি। শ্রেণী বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও তারা কেন এবং কিভাবে আধিয়ার কৃষকদের পক্ষ নিয়েছিলো তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

এ বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আধিয়ার কৃষকরা যে কারণে মধ্যস্বত্বভোগী এবং পুলিশের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি সে প্রসংগে আলোচনা করা যাক। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ১৯৭৮ সালে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠী পুলিশের সহায়তায় যখন আধিয়ার কৃষকদের জমি দখল করে নেয় তখন আধিয়ার কৃষকদের পক্ষ থেকে তেমন কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠেনি। বস্তুত এই প্রতিরোধ গড়ে না উঠার পেছনে সংগঠনের অভাবই ছিলো প্রধান কারণ । সংগঠন ছাড়া গ্রামগুলোর অনেকের সমর্থন থাকাতেও যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেনা তা রানীশংকৈলের চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকদের অসংগঠিত অবস্থায় প্রতিরোধ গড়ে না তুলতে পারার ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়। আধিয়ার কৃষকরা যখন অসংগটিত ছিলো তখন চার গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী এবং পেশার লোকজনের নৈতিক সমর্থন আধিয়ার কৃষকদের প্রতি ছিলো । কিন্তু এ নৈতিক সমর্থন কোন প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণমূলক সহযোগিতায় পর্যবসিত হয়েছিলো, চার গ্রামের সমস্ত বর্গের মানুষ আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনে পক্ষের শক্তি হয়ে এবং শ্রেণী বৈষম্য থাকা স্বত্বেও দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের বদলে সহযোগিতার সম্পর্কে উত্তীর্ণ হয়েছিলো- এ পেক্ষাপটকে বিশ্লেষণের জন্য আধিয়ার কৃষকদেরকে যে সংগঠনটি সংগঠিত করেছিলো সে সম্পর্কে এবং মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর সদস্যরা চার গ্রামের বাইরের হওয়ার বিষয়টিকেও বিবেচনায় আনতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে 'কৃষক মুক্তি সমিতি' নামে যে সংগঠনটি নেতৃত্ব দিয়েছিলো। এই সংগঠনটির আদর্শিক ভিত্তিতে ছিলো মার্কস-লেনিনীয় রাজনীতি। তাত্ত্বিকভাবে এই সংগঠনটি ছিলো মেহনতি কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর একটি সংগঠন। শোষিত শ্রেণীর পক্ষের সংগঠন হিসেবে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই এবং শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার আদর্শিক ভিত্তির সংগে সংগঠনটি সম্পর্কিত ছিলো। রাণীশংকৈলের প্রেক্ষাপটে 'কৃষক মুক্তি সমিতি' নামে এই বাম ধারার সংগঠনটির গঠন, নেতা-কর্মীদের শ্রেণীগত এবং সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যে আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি যে, ১৯৭৮ সালের দিকে মাত্র বিশ/পঁচিশ জনের উদ্যোগে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংগঠনটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত লোকজন। স্কুল শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, ছাত্র এবং মাঝারী ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বই সংগঠনে প্রধান ছিলো। বস্তুত যে, সংগঠনটির সূচনা লগ্নেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রধান ছিলো। পরবর্তীতে সংগঠনের ব্যাপক প্রসারের আলোচনাতেও দেখা গেছে যে সংগঠনে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকজন ছাড়াও উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন আরো ব্যাপকভাবে যোগ দেয়। এবং পরবর্তীতেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বেই সংগঠনটি পরিচালিত হয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে রাণীশংকৈলের আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন 'কৃষক মুক্তি সমিতি'র উত্থান এবং বিকাশের বিষয়টিও ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। গরু চুরি, ডাকাতি-রাহাজানি এবং কৃষকদের কাছ থেকে হাট তোলা আদায়ের মতো ঘটনাগুলোতে যখন রাণীশংকৈলের সর্বস্তরের কৃষক এবং সাধারণ মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলো। এবং এসব বিষয়ে থানা-পুলিশের পরোক্ষ ভূমিকার বিষয়টাও সাধারণ মানুষের ধারণায় যখন প্রায় স্পষ্ট — এমন একটা অবস্থায় 'কৃষক মুক্তি সমিতি' নামে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সূচনা লগ্নেই চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি এবং হাটতোলা আদায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানায় সংগঠনটি। এ আহবানে ব্যাপক সারা দেয় সর্বস্তরের জনসাধারণ। কারণ চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি রাণীশংকৈলের সর্বশ্রেণীর কৃষক এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা ছিলো; কোন নিদিষ্ট শ্রেণীর মানুষের সমস্যা ছিলো না। বস্তুত 'কৃষক মুক্তি সমিতি' নামে সংগঠনটির বিকাশ পর্বে আদর্শিক দিক অর্থাৎ মার্কসীয়-লেনিনীয় শ্রমিক শ্রেণীর ধারা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর তাত্ত্বিক গুরুত্বের চেয়ে সর্বস্তরের কৃষক-সাধারণের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলোই প্রাধান্য পেয়েছিলো এবং এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে সংগঠনটির উদ্যোগ থাকাতে সংগঠনে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকরা 'কৃষক মুক্তি সমিতি'র কর্মসূচী এবং কর্মকান্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সংগঠনে যোগ দেন। আধিয়ার কৃষকদের সাথে সাথে চার গ্রামের উচ্চ বিত্ত, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য পেশার লোকজনও সংগঠনটিতে সংগে যোগ দেন। তবে চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকদের মূল সমস্যাটি যেহেতু ভূমি কেন্দ্রিক একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিলো সেহেতু এ সমস্যাকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যেই মূলত তারা সংগঠনে যোগ দেন এবং সংগঠনটিকে তাদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করেন। চার গ্রামের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনও সংগঠনের সদস্য হিসেবে *আধিয়ার কৃষকদের* জমির সমস্যাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে আহবান জানান। আরো একটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ চার গ্রামের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজনের 'কৃষক মুক্তি সমিতি' নামে সংগঠনটিতে যোগ দেয়ার আগে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একাংশ কোন দলের সংগে সম্পর্কিত ছিলেন না; আর যারা সম্পর্কিত ছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিংবা সদস্য ছিলেন । তবে ঐ গ্রামগুলোর উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তদের মধ্যে নেতা পর্যায়ের ছিলেন না।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের নির্দেশে আধিয়ার কৃষকদের কাছ থেকে ফসলের ভাগ নেয়া হতো তখনও সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোর ঐ দলের সমর্থকরা আপত্তি করেন নি। কিংবা দলের প্রতি ক্ষুব্ধ হ'ননি। কিন্তু ১৯৭৫ সাল পরবর্তীকালে জাল-দলিল এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় যখন উক্ত দলের নেতৃস্থানীয় লোকজনের নেতৃত্বে আধিয়ার কৃষকদের জমি দখল করে নেয়া হয় তখন তারা ক্ষুব্ধ হ'ন এবং এ বিষয়টিকে একটা অন্যায় কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠীর দ্বিতীয় দফা উত্থানে তারা ক্ষুব্ধ হ'ন। মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর সদস্যরা চার গ্রামের ছিলো না। কিন্তু চার গ্রামের বাইরের হলেও এই স্বার্থগোষ্ঠীর মূল চালিকা শক্তি এবং বেশির ভাগ সদস্যই একটি নির্দিষ্ট দলেরই পরিচয় বহন করতেন। অর্থাৎ ১৯৭৫ সাল পূর্ববর্তীকালে ক্ষমতাসীন দলের পরিচয় বহন করতেন।

চার গ্রামের উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা (তারাও, যারা ১৯৭৫ সাল পূর্ব ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন) পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি দখলের বিষয়টাকে তাদের গ্রামে একটা অন্যায় উদ্যোগের বাস্তবায়ন হিসেবে দেখেছিলেন। এবং এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্যই আধিয়ার কৃষকদের সংগে তারাও 'কৃষক মুক্তি সমিতি'তে যোগ দেন এবং আন্দোলনের সর্বস্তরে

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর বিপক্ষে অবস্থান ঠিক রাখেন । এবং পরবর্তীতে তাদের অনেকেই রাণীশংকৈলের আন্দোলনে সংগঠক এবং নেতা হিসেবে বিকশিত হয়েছিলেন।

আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, চার গ্রামের সর্বস্তরের লোকজন তাদের গ্রামে সংঘঠিত অন্যায় উদ্যোগকে প্রতিহত করার জন্যই আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনের শক্তি হিসেবে বিকশিত হয়েছিলেন। শ্রেণী বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আধিয়ার কৃষকদের জমি কেন্দ্রিক সমস্যার ইস্যুতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং একই সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে সদস্য এবং সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় বোঝা যায় যে, ঘটনার নির্দিষ্ট ধরনের প্রেক্ষাপটের কারণেই চার গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক কোন সম্পর্কের অনুপস্থিতি এবং সহযোগীতার সম্পর্কের উপস্থিতির বিষয়টি সম্ভব হয়েছিলো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, আধিয়ার কৃষকদের শ্রেণীগত অবস্থানের বিচারে 'কৃষক মুক্তি সমিতি' নামক বামপন্থী সংগঠনটির নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার ঘটনাটি উক্ত সংগঠনটির আদর্শিক রাজনীতির সংগে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু এটাও বিবেচ্য বিষয় যে, আন্দোলনের প্রতিপক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটির সদস্যরা কোন একক প্রতিনিধিত্বশীল শ্রেণীর সদস্য না হওয়ায় স্বার্থগোষ্ঠীটিকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায় না। কারণ ঐ স্বার্থগোষ্ঠীতে ছিলো বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের সমন্বয় এবং যা ছিলো স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন বা রাষ্ট্রের শক্তির উপর নির্ভরশীল। এবং রাষ্ট্রের উপর এই নির্ভরশীলতার কারণেই স্বার্থগোষ্ঠীটি ছিলো জনবিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে আন্দোলনের গ্রামগুলোর উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং অন্যান্য পেশার লোকজন আধিয়ার কৃষকদের পক্ষের শক্তি হিসেবে মেরুভূত হওয়া এবং আন্দোলনের সংগঠনের সদস্য ও অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে ভূমিকা রাখার বিষয়টিকে ঘটনার প্রেক্ষাপটের ফলাফল ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক রাজনৈতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

রাণীশংকৈলের আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধগত অবস্থানটি আরো স্পষ্ট হয় যখন আন্দোলনের এক পর্যায়ে সমগ্র এলাকার স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং সংস্কৃতিকর্মী ঐক্যবদ্ধভাবে আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনের পক্ষের শক্তি হয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে। বস্তুত রাণীশংকৈলের আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠী ও পুলিশী নিপীড়ন তথা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং কুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বিকল্প একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলো। বিকল্প একটি

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো কেন? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এবং এ প্রশ্নটি রাণীশংকৈলের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কৃষক আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীর মেরুভবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।

'কৃষক মুক্তি সমিতি' নামক রজনৈতিক সংগঠনটির উত্থানের পূর্বে অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদী দল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টীর উপস্থিতি রাণীশংকৈলে ছিলো। ১৯৭৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলটির রাজনৈতিক আধিপত্যের দিকটি ক্ষুন্ন হয়। ১৯৭৯ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে এলাকার জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে। কিন্তু এই নির্বাচিত সংসদ সদস্য রাণীশংকৈল এলাকার না হওয়ায় রাণীশংকৈলে তাঁর দলের তেমন বিকাশ ঘটেনি। ফলে রাণীশংকৈলের রাজনীতিতে বিকল্প রাজনৈতিক দলের শূন্যতা থেকেই যায়। অবশ্য এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তন হলেও রাণীশংকৈলের সাধারণ মানুষের সমস্যা কমেনি। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এলাকার সাধারণ মানুষ গরুচুরি, কৃষিপণ্যের নিম্নমূল্য, ডাকাতি-রাহাজানি প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পরেছিলো। জামায়াতে ইসলামী এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মতো সংগঠনগুলো রাণীশংকৈলে থাকলেও স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে এই দলগুলো সাধারণ মানুষের সমস্যা কেন্দ্রিক কোন কর্মসূচী দেওয়ার চেষ্টা করেনি। এবং সাধারণ মানুষের কাছে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নামক দলটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থন পুষ্ট এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামক দলটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সমর্থন পুষ্ট রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য হয়েছিলো। এই দলগুলোর কর্মসূচী বিহিন অবস্থানই সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐরকম ভাবার বিষয়টিকে পরিষ্কার করেছিলো। তবে এই দলগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল থাকায় এলাকায় খুব একটা পরিচিতিও ছিলো না। এমন একটা অবস্থায় রাণীশংকৈলের স্থানীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামক দলটি জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতায় না থেকেও স্থানীয় ক্ষমতা অনুশীলনে একটা জায়গা করে নেয়। এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনের সংগে দলটির স্থানীয় নেতৃত্বের মূল অংশের সম্পর্কই হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতা অনুশীলনের একমাত্র মানদন্ড। রাণীশংকৈলের আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনে প্রতিপক্ষ মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীর নেতৃত্বেও ছিলো এই দলটির নেতৃস্থানীয় লোকজন। এই দলটি ছিলো বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতয়িতাবাদী দলেও ছিলো বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন। এই দু'টো দলেরই কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থকে সংরক্ষণ করার দর্শনগত ভিত্তি ছিলো না।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে দেশ শাসনের লক্ষ্যেই এ দল দু'টোর কর্মসূচী আবর্তিত ।

রাণীশংকৈলের আন্দোলনে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর মধ্যেকার বিরোধকে নিরসনের জন্য ঐ এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সমঝোতার ঐ উদ্যোগে আধিয়ার কৃষকদেরকে বর্গায় জমি আবাদের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে তাদের দখলকৃত জমি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিলো। সমঝোতায় আরো বলা হয়েছিলো যে, মধ্যস্বত্বভোগীরা ফসলের অর্ধেক ভাগ আধিয়ারদের কাছ থেকে ততোদিন পর্যন্ত গ্রহণ করবে যতদিন না জমির মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়টি আদালতে নিস্পত্তি হয়। এবং মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য উভয় পক্ষই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিবে।

কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে যে সমঝোতা হয় তা কিছু দিনের মধ্যেই অমান্য করে। এবং পরবর্তীতে সংসদ সদস্যের পক্ষ থেকে আর কোন সমঝোতার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে এটাই স্পষ্ট হয় যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের সমঝোতার উদ্যোগে সদিচ্ছার অভাব না থাকলেও জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টি নিস্পত্তি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ চার গ্রামের জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধটি ছিলো রাষ্ট্র প্রক্রিয়ারই ফসল। আর মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি যেহেতু স্থানীয় রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ছিলো সেহেতু এ ধরনের সমঝোতার উদ্যোগকে অগ্রাহ্য করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিলো। নির্বাচিত সাংসদের পক্ষ থেকে আর কোন উদ্যোগ না নেয়ার বিষয়টি থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে ঐ সাংসদ তার রাজনৈতিক নীতি (বাংলাদেশ জাতিয়তাবাদী দল) এবং অবস্থান থেকেই রাণীশংকৈলের প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেতে চাননি। যদিও তার মৌখিক সমর্থন আধিয়ার কৃষকদের পক্ষেই ছিলো। তার এই মৌখিক সমর্থন থেকে শুধু এটুকুই স্পষ্ট হয়েছিলো যে তিনি বা তার দল মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটির পক্ষের নয়।

রাণীশংকৈলের রাজনীতিতে এমন একটা জনবিমুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো যা এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং মধ্যবিত্ত, সংস্কৃতিকর্মীসহ এলাকার বিভিন্ন পেশার লোকজনের মধ্যে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিলো। এবং এমন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে শ্রেণী নির্বিশেষে এলাকার জনগণ একটা বিকল্প রাজনৈতিক ধারার সন্ধান করেছিলো। 'কৃষক মুক্তি সমিতি'র উত্থান জনসাধারণের এই বিকল্প রাজনৈতিক ধারার আকাঙ্ক্ষার জায়গাটা অনেকখানি পূরণ করতে পেরেছিলো যার প্রেক্ষিতে রাণীশংকৈলের আন্দোলনে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজন মেরুভবন প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের পক্ষের শক্তি হয়ে উঠেছিলো। বস্তুত 'কৃষক মুক্তি সমিতি'

Dhaka University Institutional Repository

নামক সংগঠনটি মার্কসীয়-লেনিনীয় আদর্শের সংগঠন হলেও রাণীশংকৈলের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিচারে স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন হিসেবে বিকশিত হয়েছিলো এবং সংগঠনটির নেতৃত্বে প্রধানত মধ্যবিত্তরা থাকলেও উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকজনও নেতৃত্বে এসেছিলো। এবং এই মেরুভবন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি এবং স্থানীয় প্রশাসন তথা রাষ্ট্র আন্দোলনের তথা সমাজের বিপক্ষের শক্তি হিসেবে এবং কৃষক মুক্তি সমিতির নেতৃত্ব সমাজের পক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো।

রাণীশংকৈলের আন্দোলনে উপরোক্ত মেরুকরণের কারণে এবং আন্দোলনের তীব্রতায় স্থানীয় স্বার্থগোষ্ঠী এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাষ্ট্র জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পরেছিলো কিন্তু তথাপি আন্দোলন দমনের জন্য ব্যাপক শক্তি প্রদর্শন করেছিলো। আন্দোলনকে দমনের জন্য কৃষক ও কৃষক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন ব্যাপক নির্যাতন এবং বহু মিথ্যা মামলা দায়ের করে শত শত লোককে জেল-হাজতে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলো। এবং আদালতের দীর্ঘসূত্রতার কারণে আন্দোলনের পক্ষের শক্তি ব্যাপক হয়রাণীর শিকার হয়েছিলো। রাণীশংকৈলে পুলিশ এবং ফৌজদারী আদালতের ভূমিকা থেকেও বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি জনবিচ্ছিন্ন হয়েও নিপীড়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নমূলক ঘটনাগুলো থেকে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শুধু স্থানীয় পর্যায়ে মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটিকে রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের এ ভূমিকা ছিলোনা বরং ঘটনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, মূলতঃ রাণীশংকৈলে বিকাশমান সামাজিক শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যই রাণীশংকৈলে রাষ্ট্র দমনমূলক ভূমিকা নিয়েছিলো।

রাণীশংকৈলের আন্দোলনে স্থানীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রকে যে ভূমিকায় দেখা গেছে তা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান । এবং সমাজের ছদ্মবেশে রাষ্ট্র একটা সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করে। মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠীটি রাণীশংকৈলের স্থানীয় রাজনীতি এবং সমাজ কাঠামোয় একটি রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে দীর্ঘ দিন ধরে যে প্রভাব বজিয়ে রেখেছিলো তা বস্তুত রাষ্ট্রের শক্তির উপর ভর দিয়েই সম্ভব হয়েছিলো। পাশাপাশি রাষ্ট্রও এই স্বার্থগোষ্ঠীর উপর ভর দিয়ে সামজের ছদ্মাবরণ ধারণ করেছিলো এবং তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলো ।

রাণীশংকৈলের আন্দোলনে 'রাষ্ট্রের ভূমিকা' সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র সম্পর্কে হামজা আলাভী এবং এ.জি. ফ্রাঙ্ক -এর তত্ত্বেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করি। তাদের মতে,

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশিক শাসন-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে উপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা গড়ে উঠা রাষ্ট্র এখনও টিকে আছে। তাই উপনিবেশোত্তর দেশগুলোতে অভ্যন্তরীণ সামাজিক শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান আমলাতন্ত্র হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রণহীন । উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শ্রেণীসমূহের নিয়ন্ত্রণ থেকে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন।

তৃতীয়তঃ একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে স্থানীয় সমাজে মেরভবন, সামাজিক শক্তির বিন্যাস এবং তার ফলাফলও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, স্থানীয় সামজের নির্বাচক মন্ডলী (Electorate) স্থানীয় এবং সংসদ নির্বাচনে আন্দোলনের সংগঠকদের নির্বাচনে বিজয়ী করেছিলো। এটা মূলত স্থানীয় সমাজের আকাঙ্খারই প্রতিফলন। একটা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠা নেতৃত্বকে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষমতা কাঠামোয় নির্ধারক শক্তি হিসেবে ভূমিকা গ্রহণের স্বীকৃতি দেয়ার এই ঘটনাটিকে স্থানীয় স্বার্থগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে এবং সামাজিক শক্তির উত্থান প্রক্রিয়ায় জনগণের চেতনা ও আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশের স্পষ্ট প্রতিফলন বলাই সঙ্গত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :—

১. রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে ছিলো চার গ্রামের জমির মালিকানার সমস্যা । ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধের কারণে অবাংগালী ভূস্বামীর অনুপস্থিতি এবং যুদ্ধ পরবর্তীকালে তৎকালীণ শাসক দলের স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে উত্থানই সমস্যাটি উৎপত্তির পেছনে মূল কারণ ।

২. উৎপাদন সম্পর্কে চার গ্রামের বর্গাদার কৃষকদের অবস্থান কিংবা উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্ট শোষণ ও বঞ্চনা প্রসূত কোন দ্বন্দ্ব কিংবা উৎকণ্ঠা রাণীশংকৈলের আন্দোলনে অনুপস্থিত ছিলো। জমির মালিকানা ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা সত্বেও দীর্ঘ দিনের ভোগদখলকৃত জমি এবং তার সাময়িক বন্দোবস্ত প্রাপ্তির যৌক্তিকতায় জমির উপর *আধিয়ার কৃষকদের* অধিকারের প্রশ্নটি জাগ্রত হয়েছিলো। স্থানীয় স্বার্থগোষ্ঠী এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাষ্ট্র *আধিয়ার কৃষকদের* জমির উপর অধিকারের এ বিষয়টিকে আঘাত করার মধ্যেই মূল দ্বন্দ্ব নিহিত। এই দ্বন্দ্ব থেকেই *আধিয়ার কৃষকদের* মধ্যে ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিলো। *আধিয়ার কৃষকদের* গ্রামগুলোর সমস্ত বর্গের মানুষের মধ্যেও এই ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত হয়েছিলো এবং আধিয়ার কৃষকদের প্রতি তাদের নৈতিক সমর্থন ছিলো । এই নৈতিক সমর্থন অন্যায় ও অযৌক্তিক উদ্যোগের প্রতি গ্রাম সম্প্রদায়ের সমর্থন না থাকার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে এবং এটাকে গ্রাম সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্যও বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোন জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ, বিক্ষোভ এবং উৎকণ্ঠা ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলনের রূপ নেয়না যতক্ষন পর্যন্ত না এক বা একাধিক সংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠন শোষিত বা উৎকণ্ঠিত ঐ জনগোষ্ঠীর সমস্যাটিকে আন্দোলনের ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে । রাণীশংকৈলের আন্দোলনে 'কৃষক মুক্তি সমিতি' একটি সংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা পালন করেছিলো যার ফলে চার গ্রামের *আধিয়ার কৃষকদের* সমস্যাটি আন্দোলনে রূপ নেয়।

৪. কোন স্বার্থগোষ্ঠীর অযৌক্তিক এবং অন্যায় কোন উদ্যোগকে প্রতিহত করতে স্থানীয় সমাজ এগিয়ে আসে। ভূমি ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের বদলে সংহতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা রাণীশংকৈলের আন্দোলনে স্পষ্ট হয়েছে। এ থেকে বলা যায় যে, ভূমি ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে আন্দোলনের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ নির্ধারণ রাণীশংকৈলের আন্দোলনে অনেকটা অসম্ভব। এবং আন্দোলনে মেরুভবনের দিকটাকে বিবেচনায় আনলে দেখা যায় যে রাণীশংকৈলের আন্দোলনে একদিকে ছিলো শ্রেণী নির্বিশেষে স্থানীয় সমাজ (Local Society) এবং অন্যদিকে স্বার্থগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র ((State Class) । রাণীশংকৈলের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলা যায় যে, ভূমি ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস ও শ্রেণী শোষণের ফলে দ্বন্দ্বমূলক শ্রেণী সম্পর্কের বিচারে রাণীশংকৈলের আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করা যায় না । এখানে মূল দ্বন্দ্বটিকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসেবেই চিহ্নিত এবং ব্যাখ্যা করা সঙ্গত।

৫. রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের প্রধান ইস্যু চার গ্রামের জমির মালিকানা সমস্যা কেন্দ্রিক হলেও আন্দোলন ঐ একটি মাত্রায় সীমিত থাকে নি। এবং ফলাফলের দিক থেকেও এ আন্দোলন ছিলো বহু মাত্রিক । স্থানীয় নির্বাচন এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে স্থানীয় সমাজের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটার বিষয়গুলো আন্দোলনে বহুমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে ।

উপরে বর্ণিত সাধারণ সিদ্ধান্তগুলো রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের বহুমাত্রিক ঘটনা এবং ঘটনার আন্তঃসম্পর্ক নিরূপণ ও পর্যালোচনার নির্যাস । বস্তুত এ অনুসিদ্ধান্তগুলোই আলোচ্য গবেষণার সমাজতত্ত্ব ।

Teodor Shanin, James C. Scott, Ranajit Guha, E.R. Wolf প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীগণ কৃষক আন্দোলনের উপর গবেষণা করেছেন। উল্লেখিত সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে। রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের সমাজতত্ত্বের সংগে উক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের অনেক মিল হয়তো থাকবে আবার অনেক কিছুই হয়তো মিলবে না। বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আমরা বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কিত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। ঐ আলোচনার সূত্র ধরেই সমাজবিজ্ঞানীদের দেয়া তত্ত্ব এবং বর্তমান গবেষণার

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতত্ত্বের মধ্যেকার মিল, অমিল এবং নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলোচনার মধ্যদিয়ে আমরা উপসংহারে পৌছাবো।

সমাজবিজ্ঞানী Teodor Shanin কৃষক আন্দোলনের শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং তিন ধরনের কৃষক আন্দোলনের কথা বলেছেন। তাঁর এই তিন ধরনের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে- Independent class action; Guided political action এবং Fully Spontaneous amorphous Political action. এই তিন ধরনের কৃষক আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Shanin বলেছেন :

1. *Automomous class action.* In the sense suggested by Marxist theory as defined in Marx's own lifetime. In this type of action, a social class crystallizes in the course of conflict, creates its own nationwide organization, works out its ideology, aims and symbols, and produces leaders, mostly from within its own ranks. For today's peasantries, this pattern of political action is the least frequent.

2. *Guided political action,* in which the social group concerned is moved by an external power-elite which unites it. This pattern of action is especially important when peasantry is concerned. The cyclical stability of the farm and the village and the political implications of this are generally overcome only by a severe crisis, met by an exogenous factor of sweeping political and emotional power, Such an external organizer of the peasantry may be found in millenial movements, secret societies, Russian cossacks. French Bonapartism or Mao's people's army, which provided the peasantry with the missing element of unity on a wider inter-village and inter-regional scale. The common element found in all thse very different movements is the existence of a closely knit group of activists, with its own impetus, specific orgazizational structure, aims and leadership - a group for which the peasantry is an object of leadership or manipulation. The peasantry, in this case, may be 'used' (i.e. deliberately tricked into some action alien to its own interests) or 'led to achieve its own aims': but the very definition of 'aims' is in the hands of qualitatively distinct leaders. The peasants' interests and attitudes are only one of the factors taken into account.

3. *Fully Spontaneous amorphous political action.* This pattern seems to be highly typical of peasants' impact on politics, and may take two forms:

(a) Local riots which 'suddenly' emerge as short outbursts of accumulated frustration and rebellious feeling. On the whole easily repressed by the central authorities, these riots may act as a check on the state policy and stimulate its change. When related to crisis in other spheres riots may develop into

Dhaka University Institutional Repository

nationwide movements capable of a determining effect on major political development.

(b) Peasant passivity. The conceptual grasp of passivity as a factor of dynamics poses some complex questions. Yet the spontaneous restriction of production by the Russian peasantry in 1920 proved strong enough to frustrate the will of a government victorious in a war against numerous and powerful enemies. Government decrees and orders the world over have been voided of effect by their spontaneous, strubborn and silent non-fulfilment by peasantry. The relationship between basic social features of peasant society as discussed and passive resistance seems evident. It served dissent but, on the other hand, the influence of the conservative peasant 'apathy' has often proved decisive for the securing of the victory of the Establishment over the revolutionaries. Once again, this must be understood in relatiohn to the peasant social structure, consciousness and experience. (Shanin, 1971: 360-61)

বলা বাহুল্য স্বাধীন বা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে কৃষক সমাজের আন্দোলন উৎপাদন সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধের কারণে ঘটে। উৎপাদন সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধের ফলে ক্রমান্বয়ে কৃষক সমাজ একটি সামাজিক শ্রেণীর রূপ নেয়। একটি শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলে, নেতৃত্ব ঠিক করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি আদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করে। রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে কৃষক আন্দোলন হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলে কৃষকদের আন্দোলন। এই ধরনের আন্দোলনে কৃষক সমাজের বাইরের এলিট শ্রেণী নেতৃত্ব দেয়। এলিট শ্রেণী কৃষক সমাজকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের জন্য আবেগপ্রবণ করে তোলে এবং কৃষকদের অংশ গ্রহণে আন্দোলন বিশাল রূপ ধারণ করে। স্বতঃস্ফূর্ত অথচ সুনির্দিষ্ট আকারহীন কৃষক আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধরন। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক সমাজের মধ্যকার দীর্ঘ দিনের হতাশা এবং ক্ষোভের হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং বিদ্রোহের অনুভূতি নিয়ে কৃষক সমাজ ব্যাপক সংগ্রামের জড়িয়ে যায়। আন্দোলনের শুরুতেই রাজনৈতিক সংযোগের ব্যাপারটি এই ধরনের আন্দোলনে থাকে না। আবার হতাশা এবং ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও কৃষকরা আন্দোলনে অনাগ্রহ এবং অক্রিয় (Passive) থাকে। এই অক্রিয়তাও এক ধরনের প্রতিরোধ। একই ধরনের মধ্যে দু'রকম ধারা থাকার কারণেই কৃষক আন্দোলনের এই ধরনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ।

Shanin যে Independent class action-এর কথা বলেছেন তার সংগে যদি আমরা রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনকে মিলিয়ে দেখি তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন Shanin চিহ্নিত আন্দোলনের এই ধরনটির সংগে তেমনভাবে মেলেনা। কারণ উৎপাদন সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধের কারণে কৃষক সমাজ একটি সামাজিক শ্রেণীর রূপ নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে সংগঠন এবং নেতৃত্ব গড়ে উঠার মতো ঘটনাগুলো রাণীশংকৈলের আন্দোলনে দেখা যায় না। অবশ্য একটি আদর্শের

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার এবং আন্দোলন পরিচালনার বিষয়টি রাণীশংকৈলে ঘটেছিলো। কিন্তু ঐ সংগঠনটি কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলেও উৎপাদন সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধের ফলে শোষিত কৃষক সমাজ থেকে উত্থিত একটি সামাজিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত হয়নি। এই সংগঠনটির আদর্শিক ভিত্তি শোষিত কৃষক-মেহনতি শ্রেণীর জন্য হলেও মূলত সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলো রাণীশংকৈলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী; অবশ্য উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকজন পরবর্তীতে নেতৃত্বের অংশ হিসেবে এসেছিলো। ইতোমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, চার গ্রামের আধিয়ার কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে বর্গা জমির ফসল জমির মালিককে (অবাংগালী মালিক) দিয়ে এসেছিলো এবং তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ ছিলোনা। আধিয়ার কৃষক এবং জমির মালিকের মধ্যে কোন বিরোধ না থাকার বিষয়টি থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উৎপাদন সম্পর্কে বিরোধের ব্যাপারটি রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের কারণ ছিলো না। স্বাধীনতা উত্তরকালে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধই ছিলো মূল বিরোধ এবং এই বিরোধের মূলে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী নয় বরং স্থানীয় রাষ্ট্রের ভূমিকারই ছিলো প্রধান কারণ। যদিও মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থগোষ্ঠী আধিয়ার কৃষকদের প্রতিপক্ষ হিসেবে অনেক বেশী দৃশ্যমান ছিলো।

Shanin কৃষক আন্দোলনের Guided Political action-এর যে ধরনটি উল্লেখ করেছেন। তার সংগে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের ধরনের কিছু অমিল থাকলেও অনেক বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরনের কৃষক আন্দোলনে একটি রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রধান শর্ত বলে Shanin উল্লেখ করেছেন। আন্দোলনের পক্ষে একটি রাজনৈতিক দলের মুখ্য ভূমিকার বিষয়টি থেকে Shanin উল্লেখিত Guided Political action - ধরণটির সংগে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের ধরটি মেলে যায়। এই ধরনের কৃষক আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে Shanin বলেছেন যে, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যেই কৃষকদের আন্দোলন পরিচালিত হয়'। কিন্তু রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। কারণ আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিলো স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সমাজের একটি আন্দোলন হিসেবে। অবশ্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোর ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য আন্দোলনটির ছিলো। ইউনিয়ন পরিষদ এবং জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি নির্বাচনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটি থেকে এটা স্পষ্ট হয়। তবে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনটি যেহেতু একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলেরই অংশ হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো সেহেতু জাতীয় পর্যায়ের এই রাজনৈতিক দলটির ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষা থাকার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। এই আকাঙ্ক্ষা হয়তো স্পষ্ট হতো যদি রাণীশংকৈলের মতো আরো অনেক এলাকায় উক্ত দলটির নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

আরো অনেক আন্দোলন পরিচালিত হতো। আমরা যেহেতু রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের সমাজতত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা করছি সেহেতু এটা স্পষ্ট যে রাণীশংকৈলের আন্দোলনের লক্ষ্য স্থানীয় প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখল হলেও জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য ছিলো না।

Fully Spontaneous, amorphous Political action নামে Shanin কৃষক আন্দোলনের যে ধরনটির কথা বলেছেন তার আংশিক মিলও রাণীশংকৈলের আন্দোলনের ধরনে পাওয়া যায়। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক সমাজের দীর্ঘ দিনের হতাশা এবং ক্ষোভের হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ ঘটার মধ্যদিয়ে ব্যাপক সংগ্রামে কৃষক সমাজের জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি এই ধরনের কৃষক আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে Shanin উল্লেখ করেছেন। রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষক সমাজের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। রাণীশংকৈলের চারগ্রামের কৃষকদের জমির সমস্যাটি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষক তথা কৃষক সমাজের মধ্যে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির মতো ঘটনাগুলো ক্ষোভের সঞ্চার করেছিলো। তবে এই ক্ষোভ কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর বিরুদ্ধে ছিলো না; ক্ষোভ ছিলো স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন এবং প্রশাসনের ছত্রছায়ায় লালিত কিছু সংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে যারা জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলো। কিন্তু রাজনৈতিক দল বা কোন সংগঠন ছাড়া কৃষকদের পক্ষ থেকেই হঠাৎ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটার রাণীশংকৈলে ঘটনা ঘটেনি। একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠিত কিছু কর্মীর উপস্থিতির বিষয়টি রাণীশংকৈলের আন্দোলনের শুরুতেই ছিলো। তবে একটি সংগঠনের উপস্থিতিতে হলেও অতি দ্রুত স্থানীয় কৃষক সমাজ সংগঠিত হয়ে ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে তোলেছিলো। অর্থাৎ কৃষক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ততার বৈশিষ্ট্যটি রাণীশংকৈলের আন্দোলনে স্পষ্টতই ছিলো।

James C. Scott-এ শতাব্দির প্রথমার্ধে উপনিবেশিক বার্মা ও ভিয়েতনামের দু'টি কৃষক আন্দোলনের উপর গবেষণা করেছেন। তার মতে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে সৃষ্ট ভূমি মালিকানা ও কর ব্যবস্থায় কৃষক উপেক্ষিত হয় এবং এ উপেক্ষা থেকে কৃষকদের মধ্যে একটা 'উপেক্ষিত হবার বোধ' জাগ্রত হয় যা কৃষক সমাজকে বিদ্রোহী করে তোলে (Scott, 1976: VII, 3-4)।

Scott বস্তুত কৃষক আন্দোলনের কারণের সংগে নৈতিকতার প্রশ্নটিকে জড়িত করেছেন। তাঁর মতে নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও ন্যায় বিচার সম্পর্কিত কৃষক সমাজের উপলব্ধির মধ্যেই কৃষক আন্দোলনের কারণ নিহিত। রাণীশংকৈলেরর কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভূমি মালিকানার অস্পষ্টতার দিকটি আন্দোলন গড়ে উঠার ক্ষেত্রে একটা বড় কারণ ছিলো। এই দিকটি Scott -এর তত্ত্বের সংগে অনেকখানি

Dhaka University Institutional Repository

সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় । এই মিলের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, উপনিবেশিক দু'টি রাষ্ট্রের উপর Scott গবেষনা করেছিলেন এবং ভূমি মালিকানা প্রশ্নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । আর উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ভূমি মালিকানা বিষয়টিতে আমলাতন্ত্রের প্রভাব বর্তমানেও ব্যাপকভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর তত্ত্বের অন্যদিকগুলো রাণীশংকৈলের আন্দোলনের সংগে মেলে না । কারণ রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ কিংবা ভূমিকর ব্যবস্থা দ্বারা কৃষক সমাজের উপেক্ষিত হওয়ার মতো বিষয়গুলো ঘটেনি।

সাব অলটার্ন তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা Ranajit Guha উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহে আদিবাসীদের মধ্যে 'উপজাতীয় সংহতি'র বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এই সংহতিকে তিনি কৃষক বিদ্রোহের শক্তির উৎস হিসেবে দেখেছেন । ধর্মীয় চেতনার ফলে কৃষক আন্দোলন অনেক সময় শক্তিশালী হওয়ার কথাও তিনি বলেছেন । কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত চেতনা, আঞ্চলিকতা এবং গুজবে বিশ্বাস করার প্রবণতা থাকার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন। আবার কৃষকদের মধ্যে বিশেষ অবস্থায় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের ব্যাপারটিকেও তিনি উপেক্ষা করেননি । রণজিৎ গুহ এবং সাব অলটার্ন গোষ্ঠীর লেখকরা মূলত নিম্ন বর্গের মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং তার মধ্যে উন্নত চিন্তার বিকাশ অনুসন্ধান করেন । উনিশ শতকের আন্দোলন সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেছেন এবং কৃষক সমাজের মধ্যে বিদ্রোহের কারণ খুঁজতে গিয়ে গুহ বলেছেন যে, কৃষক সমাজকে শোষণ এবং লুণ্ঠন করার কেন্দ্র হিসেবে উপনিবেশিক শহরগুলো গড়ে উঠেছে । এ রকম একটা 'বোধ' থেকে কৃষক সমাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠে (Guha, 1983: 11, 336-37)।

রনজিৎ গুহের তত্ত্ব প্রধানত আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের উপর নির্ভরশীল। আদিবাসী প্রশ্নটি যেহেতু রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো না সেহেতু তাঁর ব্যাখ্যার সংগে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের কারণকে মেলানো যায় না।

Kartodirdjo কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠার পেছনে উচ্চ মাত্রার ভূমিকর পরিশোধে কৃষক সমাজের অক্ষমতা থেকে কৃষক সমাজের মধ্যে ক্ষোভের বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন (Kartodirdjo, 1965: 43-47)। ইন্দোনেশিয়ার বাস্তবতায় নির্মিত তাঁর তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিংশ শতাব্দির শেষার্ধে বাংলাদেশের বাস্তবতায় কৃষক আন্দোলনের কারণের সংগে সম্পর্কিত করে Kartodirdjo -র বক্তব্যকে মেলানো যায় না । বস্তুত উচ্চ মাত্রার ভূমিকর পরিশোধে কৃষকদের অক্ষমতার বিষয়টি রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Hamza Alavi মতে, গরীব কৃষকরা প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলনে আদৌ জঙ্গী ভূমিকা পালন করেনা । গরীব কৃষকরা ভূস্বামীদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। ভূস্বামীরা খুব সহজেই গরীব কৃষকদেরকে তাদের প্রভাবাধীন করতে পারে । মাঝারী কৃষকের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে গরীব কৃষকরা তাতে সামিল হয় (Alavi, 1965: 95-99)।

সমাজবিজ্ঞানী Eric R. Wolf সাধারণভাবে Hamza Alavi -র মতকে সমর্থন করেন (Wolf, 1969: 1-5)। তাঁদের উভয়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভূমিভিত্তিক সামন্ত শ্রেণীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা আন্দোলনে মধ্য কৃষক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের কথা বলেছেন । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের বিষয়টি বাংলার কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেকটা অনিবার্য হিসেবেই তাঁরা দেখেছেন। রাণীশংকৈলের আন্দোলনেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের কৃষক আন্দোলন সংঘটনের বিষয়টি স্পষ্ট ছিলো । তবে Alavi এবং Wolf ভূমিভিত্তিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কে অবস্থানগত বিরোধের বিষয়টিকে যেভাবে দেখেছেন তা রাণীশংকৈলের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেভাবে দেখা যায় নি । বরং ভূমিভিত্তিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে বিরোধের পরিবর্তে সহযোগীতার সম্পর্কই রাণীশংকৈলের আন্দোলনে স্পষ্ট ছিলো।

বস্তুত সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের পরিণতিই ছিলো রাণীশংকৈলের আন্দোলনের মূখ্য বিষয় এবং এটিকে রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে ।

রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে রাষ্ট্র ও স্থানীয় সমাজের মেরুভবনের অবস্থাটিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্র সম্পর্কিত Hamza Alavi -র তত্ত্বটির সত্যতা খুঁজে পাই। Alavi রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থার কথা বলেছেন । রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলনে সংগঠিত সমাজের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন তথা রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, Hamza Alavi-র উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কিত তত্ত্বের সত্যতা আশির দশকের বাংলাদেশের রাষ্ট্রটিতেও বিদ্যমান ।

রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সংঘটিত একটি আন্দোলন । তাই ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারত কিংবা পাকিস্তান আমলে সংঘটিত কৃষক আন্দোলনগুলো থেকে কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। কারণ জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর প্রভাব আজকের বাস্তবতায় বাংলাদেশের গ্রামীণ শ্রেণী বিন্যাসে ঠিক আগের অবস্থানে নেই। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের যে দমনমূলক আচরণ তা আগের

Dhaka University Institutional Repository

মতোই আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, জোতদার ও জমিদার শ্রেণীর প্রবল উপস্থিতিতে ব্রিটিশ বাংলায় রাষ্ট্রকে ঐ শ্রেণীগুলোর সহযোগী শক্তি হিসেবে মনে হতো । আর আজকের বাস্তবতায় রাষ্ট্রের সহযোগী গোষ্ঠী বা শক্তি হিসেবে দেখা যায় স্থানীয় স্বার্থগোষ্ঠীকে, যাকে প্রচলিত কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না এবং যা স্পষ্টতই রাষ্ট্রসৃষ্ট।

রাণীশংকৈলের আন্দোলন আশির দশকের বাংলাদেশের একটি কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের কারণে, ধরনে, শ্রেণীসমূহের বিন্যাসে, দ্বন্দ্বের প্রকৃতিতে এবং আন্দোলনের মেরুভবনের প্রক্রিয়াগুলোতে কৃষক আন্দোলনের তত্ত্বের বেশকিছু মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও সবকিছু মেলেনা। বস্তুত রাণীশংকৈলের কৃষক আন্দোলন সময়, পেক্ষাপট, ধরন ও প্রক্রিয়ায় বৈচিত্রময়। এবং কৃষক আন্দোলনের সমাজতত্ত্বে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্যকেই চিহ্নিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography

Books, Articles & Reports

Alavi, Hamza, 1973, 'The State in post Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh', in *Imperialism and Revolution in South Asia*, Edited by Kathleen. Gough and Hari P. Sharma, Monthly Review Press, New York.

Alavi, Hamza, 1965, 'Peasant and Revolution', *Socialist Register,* Merlin Press.

Cooper, A., 1982, 'Share-croppers & landlords in Bengla, 1982-50: The Dependency Web & its Implications', *Journal of Peasant Studies,* Special Issue on Sharecropping & Share-croppers, London.

Dasgupta, A., 1986, 'Early Trends of Anti-Colonial Peasant Resistance in Bengal', *Social Scientist,* Vol. 14, No. 4

Desai, A.R. (ed.), 1985, *Peasant Struggles in India,* Oxford Univeresity Press, New Delhi.

Dhanagare, D.N. , 1986, *Peasant Movements in India, 1920-1950,* Oxford University Press, New Delhi.

Frank, A.G. & Fuentes M., 1987, 'Nine Theses on Social Movements', *Economic and Political Seekly,* Vol. XXII, No. 35.

Frank, A.G, 1981, *Crisis in the Third World*, Holmes and Meir Publishers, New York.

Guha, Ranajit, 1986, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* Oxford University Press, New Delhi.

Gusfield, Joseph R., 1972, 'Social Movements' *International Encyclopedia of the Social Sciences,* David L. Sills edited, *Vol. 14,* Mac millan Company & The Free Press, *New York.*

Heberle, Rudolf, 1951, 'Observations on the Sociology of Social Movements,' *Readings in Sociology',* Edited by Alfred Meclung Lee, Barnes & Nobels, New York.

Hashmi, Tazul Islam, 1997, 'Peasant Militancy and Elite Conflict in East Bengal, 1940-47', *The Journal of Social Studies,* Dhaka.

Hobsbawm E.J., 1978, *Primitive Rebels*, Manchester University Press.

International Encyclopedia of the Social Sciences, 1972, David L. Sills edited, Mac millan Company & The Free Press, New York.

Karim, A.K. Nazmul, 1980, *The Dynamics of Bangladesh Society,* Vikas Publishing House, New Delhi.

Kaviraj, Narahari, 1982, *Wahabi and Farazi Rebels,* People's Pulishing house, New Delhi.

Majumder, Asok, 1993, *Peasant Protest in Indian Politics,* NIB Publishers, New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

Kartodirdjo, Sartono. 1965, *Protest Movements in Rural Java,* Yale University Press, London.

----------, (ed.) 1982, *Subaltern Studies I- Writtings on South Asian History and Society,* Oxford University Press, New Delhi.

Mitter, S., 1977, *Peasant Movements in West Bengal,* Occasional Paper No. 8, Department of Land Economy, Cambridge University.

----------, 1975, 'Sonapur: A Peasant's View of the Class War', *South Asian review,* Vol. 8, No.4.

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1989, Oxford University Press.

Poulantzas, Nicos, 1976 'The capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau', *New left Review*, No. 75.

Prasad, P.H., 1989, 'Poor-Peasant Movement in Central Bihar', *Journal of Social and Economic Studies,* Har-Anand Publications, New Delhi.

Rahman, Atiur, 1987, 'The State and the Peasantry: The Bangladesh Case', *The Journal of Social Studies,* No. 35, Dhaka.

Rahman, H.Z., 1987, "The Rule of Law" as Executive Despotism Bangladesh: Colonial State Power and Its Structural Continuity, *The Journal of Social Studies,* No. 38, Dhaka.

Scott, James, C., 1976, *The Moral Economy of the Peasant - Rebellion and Subsistance in South-east Asia,* Yale University Press.

Shanin, Teodor (ed.), 1987, *Peasant and Peasant Societies,* Selected readings, Penguin Books, London.

Sen, Sunil, 1972, *Agrarian Struggle in Bengla 1946-47,* People's Publishing House, New Delhi.

Siddiqui, Asraf (ed.), 1972, Bangladesh District, Gazetteers, *Dinajpur*, government press, Dacca, Bangladesh.

The Oxford English Dictionary, 1933, Clarendon press, Oxford.

Westergaard, kirsten and Abul Hossain, 1994, "Mobilization for Khas Land: *Two_Experiences from Pabna"*, Mimeo, CDR Working Paper, Copenhagen, Denmark.

Weber, Max, 1968, *Economy and Society,* Bedministers Press, New York.

Wilkinson, Paul,, 1971, *Social Movement,* Praeger Publishers, London.

Wolf, E.R., 1969, *Peasant wars of the Twentieth Century,* Harper & Row.

Documents

Bertocci, P.J., 1970, *Elusive Village: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan,* Michigan State University, Ph.D Thesis.

Dhaka University Institutional Repository

Govt.of Bangladesh, 1984, Bangladesh Population Census 1981, Zila Series, *Dinajpur*, BBS.

Govt. of Bangladesh, 1988, *The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock: 1983-84*,' BBS.

Govt. of Bangladesh, 1983, District Statistics, *Dinajpur*, BBS.

Govt. of Bangladesh, 1983, *Bangladesh Population Census, 1981: Union Statistics*, BBS.

Govt. of Bangladesh, 1989, *Bangladesh Census of Non-farm Economic Activities and Disabled Resource- 1986*, BBS.

Govt. of Bangladesh, 1990, *Bangladesh Census of Non-farm Economic Activities*– 1986, BBS.

Govt. of Bangladesh, 1988, The Bangladesh Census of Agriculture and Livestock: 1983-84, Zila series, *Thakurgaon*, BBS,

Rahman, Hossain zillur, 1986, *Landed Property and the Dynamic of Instability, Bengal: state-formation under Colonialism and its Contemporary Significance*, University of Manchester, Ph.D, Thesis.

বাংলা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন

আজাদ, লেনিন, ১৯৯৭, *উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, ইউপিএল, ঢাকা ।

আজাদ, লেনিন ও শামসুজ্জোহা , ১৯৯১, "*গ্রামীণ সর্বহারার সাঁথিয়া অভ্যুত্থান*", অপ্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট ।

ইসলাম, সিরাজুল, ১৯৭৮, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, ১৯৭২, 'ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা', *মার্কস-এঙ্গেলস* রচনা সংকলন, ২য় খন্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ।

কামাল, মেসবাহ, ১৯৯২, 'ভাগ চাষ প্রথা: তাত্ত্বিক কাঠামোর নির্মাণ', *সমাজ চেতনা*, সংখ্যা - ৩, ঢাকা।

কূপার, এ্যাড্রিয়ান, ১৯৯১, *বাংলার বর্গাচাষ এবং বর্গাচাষীদের আন্দোলন*, (অনুবাদ), পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা ।

জাওয়াদ, কাজী, ১৯৮২, 'দিনাজপুরে বিচিত্রা,' *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা ।

তালুকদার, গুরুদাস, ১৯৮৮, 'তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা,' *তেভাগা সংগ্রাম*, তেভাগার ৪০তম বর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, ঢাকা।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৮১, *বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড)*, জেনারেল পাবলিশার্স, কলিকাতা।

রহমান, আতিউর ও লেনিন আজাদ, ১৯৯০, *ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রায়, সুপ্রকাশ, ১৯৮০, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ডিএনবিএ ব্রাদার্স, কলকাতা ।

রায়, সুপ্রকাশ, ১৯৮৯, *মুক্তি-যুদ্ধে ভারতীয় কৃষক*, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা ।

Dhaka University Institutional Repository

সেন, অমল, ১৯৯৪, 'নড়াইলের তে-ভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা' *বিবিধ প্রসঙ্গে,* প্রকাশক সন্তোষ কুমার রায়, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম বংগ ।

সেন, সুনীল, ১৯৮৫, *ভারতের কৃষি সম্পর্ক (১৭৯৩-১৯৪৭),* পশ্চিম বংগ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা

সেন, সুনীল, ১৯৯০, *ভারতের কৃষক আন্দোলন (১৮৫৫-১৯৭৫),* চ্যাটার্জী পাবলিশার, কলিকাতা ।

হবিব, ইরফান, ১৯৮৫, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭),* কে, পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পনী, কলকাতা ।

হোসেন, আবুল, ১৯৯৫, 'আধিয়ারের অধিকার: কেস স্টাডি রাণীশংকৈল', *দিনাজপুর: ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা ।

বাংলা পত্রিকা

সাপ্তাহিক 'নতুন কথা' তোপখানা রোড, ঢাকা।

সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা,' দৈনিকবাংলা ভবন, ঢাকা ।

দৈনিক 'উত্তরা', বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১
১৯৭২-৭৫ সালে মধ্যস্বত্বভোগী (শীর্ষ এগার জনের পরিচিতি)

নাম	ইউনিয়ন/থানা	মর্যাদাগত অবস্থান	রাজনৈতিক পরিচয়	মধ্যস্বত্ব দাবীর ভিত্তি
১. মারফত প্রধান	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	আঃ লীগের নেতা ও সংসদ সদস্য	ক্ষমতাসীন দলের নেতা
২. সারাফত মন্ডল	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	আঃ লীগ ও যুবলীগ নেতা	ঐ
৩. সলিমউদ্দিন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	আঃ লীগের স্থানীয় নেতা	ঐ
৪. তমিজ উদ্দিন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	ঐ	ঐ
৫. সাগরেদ আলী	বাচোর/রাণীশংকৈল	নিম্নমধ্যবিত্ত	আঃ লীগ সমর্থক	ক্ষমতাসীন দলের কর্মী
৬. চলা হোসেন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	নিম্নমধ্যবিত্ত	আঃ লীগ সমর্থক	ঐ
৭ রহমান	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগ কর্মী	ঐ
৮. মালেক	ঐ	নিম্নবিত্ত	ঐ	ঐ
৯. খালেক	বাচোর/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগ ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা	ঐ
১০ বাচান	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগ কর্মী	ঐ
১১. আসর আলী	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

১৯৭৫ পরবর্তীকালে মধ্যস্বত্বভোগী* (শীর্ষ স্থানীয় বার জনের পরিচিতি)

নাম	ইউনিয়ন/থানা	মর্যাদাগত অবস্থান	রাজনৈতিক পরিচয়	মধ্যস্বত্ব দাবীর ভিত্তি
১. সলিমউদ্দীন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	আঃ লীগের মধ্যম শ্রেণীর নেতা	১১০ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
২. তমিজউদ্দীন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগের মধ্যম শ্রেণীর নেতা	২২ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
৩. সাগরেদ আলী	বাচোর/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগে সমর্থক	৩০ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
৪. চেলা হোসেন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগের মধ্যম শ্রেণীর নেতা	১৭ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
৫. আসর আলী	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগ । পরবর্তীতে বিএনপি দলের সমর্থক	৪৫ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
৬. নোমান	দিনাজপুর সদর/ দিনাজপুর	মধ্যবিত্ত	ভূমি অফিসের তহসিলদার	২৫ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
৭. সুজা মোড়ল	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	নেই	১২ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
৮. জসিমউদ্দীন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	বিএনপি দলের সমর্থক	১০ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
৯. সুজাউদ্দীন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	নিম্ন মধ্যবিত্ত	বিএনপি দলের সমর্থক	১৭ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
১০. রহমত আলী	দিনাজপুর সদর/ দিনাজপুর	নিম্ন মধ্যবিত্ত	নেই	১০০ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজপত্র
১১, জোহা চৌধুরী	দিনাজপুর সদর/ দিনাজপুর	উচ্চবিত্ত	বিএনপি কর্মী	২০ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজ-পত্র
১২. ফজি	লেহেম্বা ইউনিয়ন/ রাণীশংকৈল	নিম্নবিত্ত	নেই	২ বিঘা জমির মালিকানা দাবীর পক্ষে ভুয়া কাগজ-পত্র

- *মধ্যস্বত্বভোগী মোট ৪৬ জন (সাপ্তাহিক নতুন কথা, জুলাই ৯, ১৯৮২) । তবে এই বার জনই মূল নেতৃত্বে । উল্লেখ্য যে, ৪৬ জনের মধ্যে উচ্চবিত্ত তিনজন । অনুল্লিখিত অবশিষ্টদের সামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং কয়েকজন নিম্নবিত্ত । ১-১০ বিঘা পর্যন্ত জমির ভুয়া কাগজ-পত্র তাদের মধ্যস্বত্ব দাবীর ভিত্তি।*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

১৯৭৫ পরবর্তীকালে মধ্যস্বত্ব কায়েম-এর মূল নেতৃত্ব (পরিচিতি)

নাম	ইউনিয়ন/থানা	মর্যাদাগত অবস্থান	রাজনৈতিক পরিচয়	মধ্যস্বত্ব প্রতিষ্ঠা চেষ্টার শক্তির উৎস
১. মারফত প্রধান	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	আঃ লীগ নেতা এবং প্রাক্তন এম.পি	পুলিশ, ভূমি অফিস এবং ফৌজদারী আদালত
২. সারাফত মন্ডল	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	আঃ লীগ নেতা ও প্রাক্তণ চেয়ারম্যান	ঐ
১. কাদের বিশ্বাস	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	বিএনপি নেতা	ঐ
২. সলিমউদ্দীন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	উচ্চবিত্ত	আঃ লীগের স্থানীয় নেতা	পুলিশ, ফৌজদারী আদালত ও ১১০ বিঘা জমির ভুয়া দলিল
৩. তমিজউদ্দীন	হোসেনগাঁও/ রাণীশংকৈল	মধ্যবিত্ত	আঃ লীগের স্থানীয় নেতা	পুলিশ, ফৌজদারী আদালত ও ২২ বিঘা জমির ভুয়া -দলিল

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

কৃষক আন্দোলনে থানা পর্যায়ের নেতৃত্ব (শীর্ষ স্থানীয় ১২ জনের বিবরণ)

ক্রঃনং	নাম/গ্রাম/ইউনিয়ন	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স (১৯৮১ সালে)	নিজের জমির পরিমান (বিঘা)	রাজনৈতিক পরিচয় (সত্তরের দশকে)	রাজনৈতিক পরিচয় (আশির দশকে)
১	দাহার মাষ্টার* গ্রামঃ রামপুর, হোসেনগাঁও	কৃষি	এস.এস.সি পাশ	৩৫	৭	১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), ৭২-৭৩ ন্যাপ (ভাসানী) ৭৮ গণতান্ত্রিক আন্দোলন	কৃষক মুক্তি সমিতি
২	নয়ন মোল্লা** গ্রামঃ রাণীশংকৈল রাণীশংকৈল	কৃষি	এস.এস.সি পাশ	২৫	১৫	১৯৭২ সালে সিপি(আই)এম (পঃবঃ), ৭৪ বিপ্লবী ছাত্রইঃ। ৭৯-তে লেলিনবাদী কমিঃ মেম্বার	ঐ
৩	তসিরউদ্দীন গ্রাম: নয়নপুর হোসেনগাঁও	কৃষি	দশম শ্রেণী	৪২	৫০	৭৩ ন্যাপ (ভাসানী), ৭৪- ইউপিপি, ৭৮-গঃ আন্দোলন	ঐ
৪	ফকিরুল্লা* গ্রামঃ আমজুয়ান বাচোর	কৃষি/ব্যবসা	এইচ.এস.সি পাশ	২৮	১৮	৬৯-বঃছা ই। ৭৩-এমএলসিপি সদস্য, ৭৮- গণতান্ত্রিক আন্দোলন	ঐ
৫	ইশান চন্দ্র* গ্রামঃ বলিদ্বারা হোসেনগাঁও	শিক্ষকতা	বি.এস.সি; বিএড	২৬	১৪	'৭৯ বিঃ ছাঃ ইঃ।	ঐ
৬	তজির হোসেন গ্রামঃ রাণীশংকৈল হোসেনগাঁও	কৃষি/ব্যবসা	নবম শ্রেণী	২৬	১৫	৭৮- গণতান্ত্রিক আন্দোলন	ঐ
৭	বুধা রাম গ্রামঃ বলিদ্বারা হোসেনগাঁও	কৃষি/ব্যবসা	৫ম শ্রেণী	২২	২	১৯৭৯ পর্যন্ত আঃ লীগ	ঐ
৮	আজিম গ্রামঃ বাড়গাসুন্দরপুর বাচোর	কৃষি (আধিয়ার)	২য় শ্রেণী	৩৭	২	৭৬-৭৯ মুসলিম লীগ	ঐ
৯	জয়নাল গ্রামঃ উত্তর গাঁও হোসেনগাঁও	কৃষি	৫ম শ্রেণী	৩০	২৫	৭৯ পর্যন্ত আঃ লীগ	ঐ
১০	আনিস গ্রামঃ নয়নপুর হোসেনগাঁও	কৃষি/ব্যবসা	এইচ.এস.সি পাশ	২৫	৮০	৭৭-৭৮ বিঃ ছাঃ ই	ঐ
১১	তোফির হোসেন গ্রাম: রাণীশংকৈল হোসেনগাঁও	কৃষি/ব্যবসা	এস.এস.সি পাশ	৩০	১০০	ন্যাপ (ভাসানী) ১৯৭২-৭৩ ৭৪-৭৮ ইউ.পি.পি	ঐ
১২	জহর হোসেন গ্রামঃ উত্তরগাঁও, হোসেনগাঁও	কৃষি (আধিয়ার)	এইচ.এস.সি পাশ	২৭	৪	নেই	ঐ

* কৃষক মুক্তি সমিতির জেলা কমিটির সদস্য

** কৃষক মুক্তি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

পরিশিষ্ট-৫

আন্দোলনে চার গ্রাম/মৌজায় নেতৃত্ব (প্রতিটি গ্রাম থেকে শীর্ষ স্থানীয় ১২ জনের বিবরণ)।

১. উত্তরগাঁও

ক্রঃ নং	নাম	বয়স (১৯৮১ সাল)	পেশা	শিক্ষা	আদি নিবাস	আধিয়ার কি-না	নিজ মালিকানায় জমি (বিঘা)	অবাংগালীর দেয়া আধি জমি (বিঘা)	রাজনৈতিক পরিচয় (সত্তরের দশক)	রাজনৈতিক পরিচয় (আশির দশক)
১	সবুর আলী	৫০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	০৬	১০	নেই	কৃষক মুক্তি সমিতি
২	মজির	২০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	০২	০৩	আঃ লীগ	কৃষক মুক্তি সমিতি
৩	মোতালেব	৪০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	মালদহ	না	০৪	০১	ঐ	ঐ
৪	রফিকুল	৪০	কৃষি	নিরক্ষর	বগুড়া	না	০৩	০	নেই	ঐ
৫	জয়নাল	৩৫	কৃষি	৫ম শ্রেণী	মালদহ	না	২৫	০	আঃ লীগ	ঐ
৬	জহর হোসেন	২৭	কৃষি (আধিয়ার)	এইচএসসি	বগুড়া	হ্যাঁ	৪	০৫	নেই	ঐ
৭	এশা মন্ডল	২৫	কৃষি (আধিয়ার)	৭ম শ্রেণী	বগুড়া	হ্যাঁ	২	০৪	ঐ	ঐ
৮	মজু	৪২	কৃষি (আধিয়ার)	২য় শ্রেণী	বগুড়া	হ্যাঁ	০২	০৪	ঐ	ঐ
৯	সাইফ	২৭	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	মালদহ	হ্যাঁ	০	০২	ঐ	ঐ
১০	নন্দন	৩৫	কৃষি	দশম শ্রেণী	স্থানীয়	না	৬০	০	আঃ লীগ	ঐ
১১	ফামরুল	৩৫	কৃষি	নিরক্ষর	মালদহ	না	০৩	০	নেই	ঐ
১২	হাতেম	৩০	দিন মজুর	নিরক্ষর	স্থানীয়	না	শুধু বসতবাড়ি	০	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

(পরিশিষ্ট-৫:চলতি)

২. কলিগাঁও

ক্রঃ নং	নাম	বয়স (১৯৮১ সাল)	পেশা	শিক্ষা	আদি নিবাস	আধিয়ার কি-না	নিজ মালিকানায় জমি (বিঘা)	অবাংগালীর দেয়া আধি জমি (বিঘা)	রাজনৈতিক পরিচয় (সত্তরের দশক)	রাজনৈতিক পরিচয় (আশির দশক)
১	আবু বক্কর	৪৫	কৃষি	স্বাক্ষর জ্ঞান	মালদহ	না	৩০	০	নেই	কৃষক মুক্তি সমিতি
২	সালেক	২৭	কৃষি (আধিয়ার)	স্বাক্ষর জ্ঞান	মালদহ	হ্যাঁ	০১	০৩	নেই	ঐ
৩	আব্রাহাম	৫০	কৃষি	৩য় শ্রেণী	মালদহ	না	৩৫	০	বিএনপি	ঐ
৪	মুন্নাফ	৩০	কৃষি	৫ম শ্রেণী	মালদহ	না	০৪	০	ঐ	ঐ
৫	রহিম আলী	২৮	কৃষি (আধিয়ার)	৫ম শ্রেণী	মালদহ	হ্যাঁ	০১	০৩	নেই	ঐ
৬	তেনু মুহাম্মদ	৩২	কৃষি	নিরক্ষর	মালদহ	না	১৫	০	ঐ	ঐ
৭	শরিফ	৫০	কৃষি	নিরক্ষর	মালদহ	না	১৫	০	আঃ লীগ	ঐ
৮	সমিরউদ্দীন	৪০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	মালদহ	হ্যাঁ	০৫	০২	নেই	ঐ
৯	কাশেদ আলী	৩০	দিনজমুর	নিরক্ষর	মালদহ	না	শুধু বসতবাটি	০	নেই	ঐ
১০	গমীরউদ্দীন	৪৫	কৃষি	৫ম শ্রেণী	মালদহ	না	১৫	০	আঃ লীগ	ঐ
১১	বসির	৩৫	কৃষি	স্বাক্ষর জ্ঞান	মালদহ	না	০৩	০	নেই	ঐ
১২	নেয়ামত	৪৮	কৃষি (আধিয়ার)	৫ম শ্রেণী	মালদহ	হ্যাঁ	০	০২	নেই	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

(পরিশিষ্ট-৫:চলতি)

৩. বলিদ্বারা

ক্রঃ নং	নাম	বয়স (১৯৮১ সাল)	পেশা	শিক্ষা	আদি নিবাস	আধিয়ার কি-না	নিজ মালিকানায় জমি (বিঘা)	অবাংগালীর দেয়া আধি জমি (বিঘা)	রাজনৈতিক পরিচয় (সত্তরের দশক)	রাজনৈতিক পরিচয় (আশির দশক)
১	নফের	৫০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	০	১০	নেই	কৃষক মুক্তি সমিতি
২	দবিরউদ্দীন	৫০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	২	০২	ঐ	ঐ
৩	নলিয়া	৫০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	৩	০২	ঐ	ঐ
৪	মুহাম্মদ	৫০	কৃষি (আধিয়ার)	স্বাক্ষর জ্ঞান	রাজশাহী	হ্যাঁ	২	০৪	ঐ	ঐ
৫	কিশান মাঝী	৫৫	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	ঐ	হ্যাঁ	৩	০৫	ঐ	ঐ
৬	রমেশ মাঝী	২৫	কৃষি	নিরক্ষর	স্থানীয়	না	২০	০	আঃ লীগ	ঐ
৭	ভবেশ মেস্বার	৪৫	কৃষি	৭ম শ্রেণী	স্থানীয়	না	২০	০	ঐ	ঐ
৮	সগির মন্ডল	৫৫	কৃষি (আধিয়ার)	স্বাক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	০২	০২	ঐ	ঐ
৯	তিলু রাম	২৭	কৃষি	৮ম শ্রেণী	স্থানীয়	না	১০	০০	ঐ	ঐ
১০	অরুন বর্মন	২৫	কৃষি	৮ম শ্রেণী	স্থানীয়	না	১০	০০	সি.পি.বি	ঐ
১১	বিষ্ণু বর্মন	৩০	কৃষি/ ব্যবসা	এসএসসি	স্থানীয়	না	৩০	০	ঐ	ঐ
১২	সাধু হেমরম	৪০	কৃষি নিরক্ষর	নিরক্ষর	রাজশাহী	না	৫	০	নেই	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

(পরিশিষ্ট-৫:চলতি)

৪. বাকসা সুন্দর পুর

ক্রঃ নং	নাম	বয়স (১৯৮১ সাল)	পেশা	শিক্ষা	আদি নিবাস	আধিয়ার কি-না	নিজ মালিকানায় জমি (বিঘা)	অবাংগালীর দেয়া আধি জমি (বিঘা)	রাজনৈতিক পরিচয় (সত্তরের দশক)	রাজনৈতিক পরিচয় (আশির দশক)
১	আজমত	৫১	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	৫	১২	বিএনপি সমর্থক	কৃষক মুক্তি সমিতি
২	খবিরুল	৪৫	কৃষি (আধিয়ার)	১ম শ্রেণী	বগুড়া	হ্যাঁ	০	১০	নেই	ঐ
৩	হাই	৪০	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	২	০৪	নেই	ঐ
৪	মুন্না	২২	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	বগুড়া	হ্যাঁ	৩	৪	ঐ	ঐ
৫	মসির	৪৫	কৃষি (আধিয়ার)	২য় শ্রেণী	বগুড়া	হ্যাঁ	৪	৩	আঃ লীগ	ঐ
৬	ফাবেদ	৩৫	কৃষি (আধিয়ার)	২য় শ্রেণী	বগুড়া	হ্যাঁ	২	২	নেই	ঐ
৭	লিয়ার	৩৫	কৃষি (আধিয়ার)	৫ম শ্রেণী	রাজশাহী	হ্যাঁ	০২	০২	ঐ	ঐ
৮	লক্ষণ রাম	৪২	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	রাজশাহী	হ্যাঁ	০১	১০	ঐ	ঐ
৯	ফই পাহান	২৪	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	ঐ	হ্যাঁ	০	৩	ঐ	ঐ
১০	মেজা পাহান	২৩	কৃষি (আধিয়ার)	নিরক্ষর	ঐ	হ্যাঁ	৩	০২	ঐ	ঐ
১১	সফেদ	৩০	কৃষি/ব্যবসা	৫ম শ্রেণী	বগুড়া	হ্যাঁ	০৫	০	আঃ লীগ	ঐ
১২	মুনসি	৪৮	কৃষি	৫ম শ্রেণী	ঐ	ঐ	০৪	০	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

রাণীশংকৈলের আধিয়ারদের প্রতি শিক্ষকদের সমর্থন

রাণীশংকৈলের সংগ্রামরত আধিয়ারদের সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাণীশংকৈল থানা শাখা পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সমিতির এক বৈঠকে গৃহিত এক প্রস্তাবে আধিয়ারদের সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আধিয়ারদের সাহায্যার্থে ২০০০ টাকাও দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি রাণীশংকৈল থানা শাখার পক্ষে সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল ইসরাম এই টাকা কৃষক মুক্তি সমিতি রাণীশংকৈল থানা শাখার সভাপতি জনাব আসিরউদ্দীন আহম্মদের হাতে অর্পণ করেন।

সূত্রঃ সাপ্তাহিক 'নতুন কথা', ঢাকা, নভেম্বর ৬, ১৯৮১ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭